৪৫তম বিসিএস লিখিত ফুল কোর্স

আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি

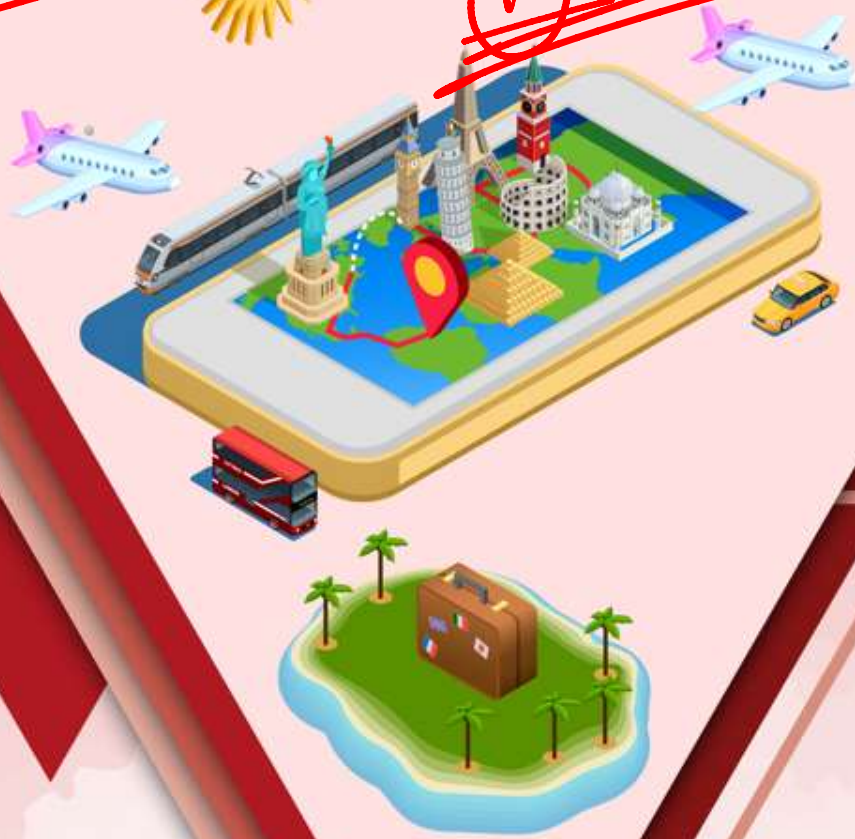

লেকচার: ০৫

টপিক:

জাতিসংঘ ব্যবস্থা: জাতিসংঘ ও এর অঙ্গ সংস্থা, জাতিসংঘের গুরুত্ব ও সীমাবদ্ধতা, জাতিসংঘের সংস্কার, জাতিসংঘ নিরাপত্তা কাউন্সিলের ভূমিকা, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা ও শান্তি প্রতিষ্ঠা কার্যাবলি, অভিবাসনের ধাপ ও গণহত্যা নিয়ন্ত্রণ/আইন, SDG নিশ্চিত করার চ্যালেঞ্জসমূহ, উন্নয়নশীল দেশগুলোর LDC থেকে উত্তরণের চ্যালেঞ্জ, মানবাধিকার এজেন্ডা, পরিবেশগত এজেন্ডা, আন্তর্জাতিক বিচার আদালত এবং নারীর ক্ষমতায়ন।

দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতি: ভারত – পাকিস্তান সম্পর্ক (কাশ্মীর সংকট), দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত – চীন দ্বন্দ্ব, ভারত বাংলাদেশ সম্পর্ক (আঞ্চলিক ভূ-রাজনীতি, পানি বণ্টন সমস্যা, সীমান্ত সমস্যা ও বাণিজ্য ভারসাম্য এবং বাংলাদেশ – মিয়ানমার সম্পর্ক।

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি
09666775566
www.uttoron.academy

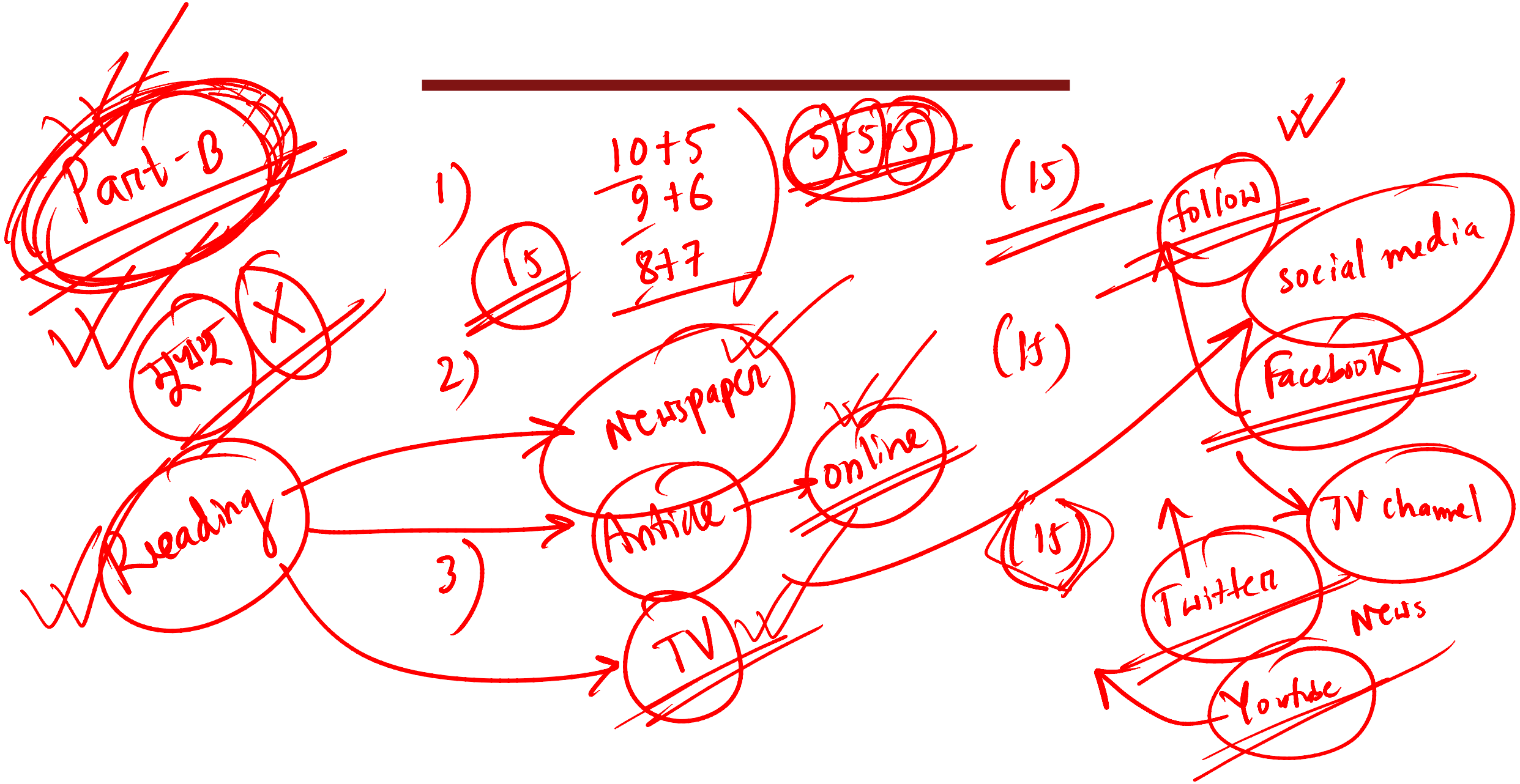
Part-B
মুখস্থ
X
Reading
1)
15
10+5
9+6
8+7
5+5+5
2)
Newspaper
Article
online
3)
TV
(15)
follow
social media
Facebook
(15)
(15)
TV chamel
Twitter
News
Youtube

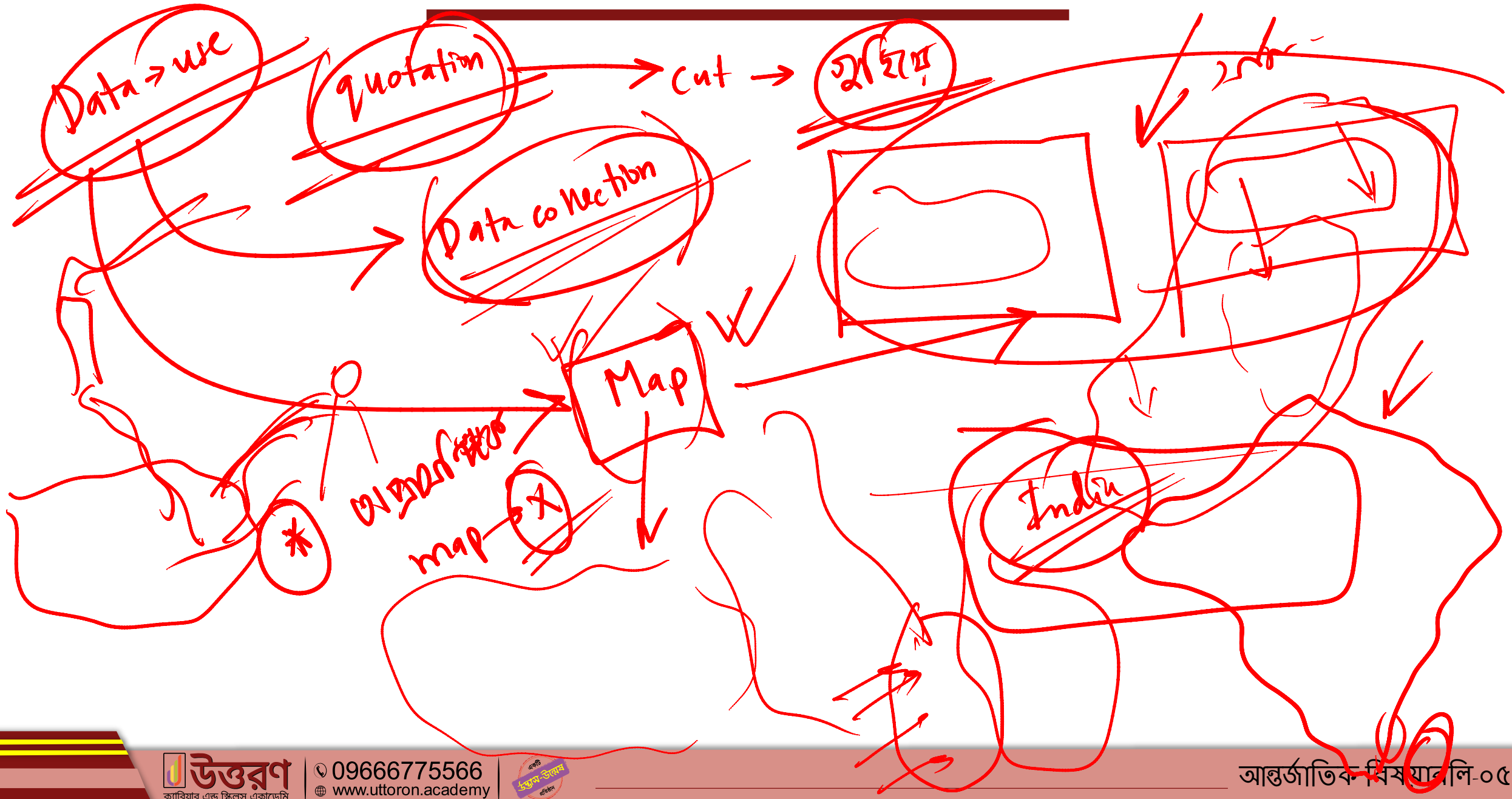

Data → use
quotation
cut
Data collection
Map
map
India

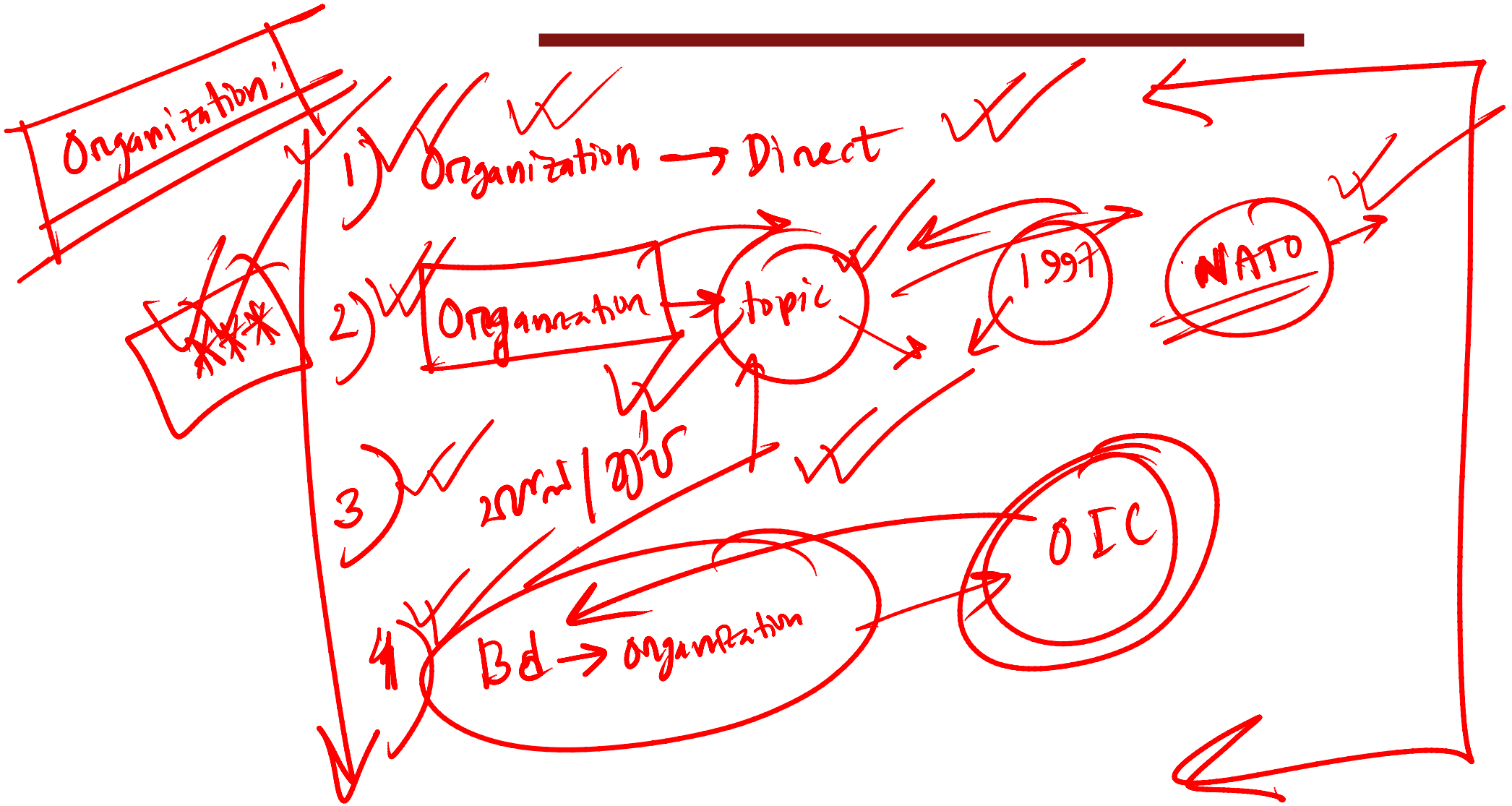

Organization:
1) Organization → Direct
2) Organization → topic
1997
NATO
3)
4) Bd → organization
OIC

How to Answer:

ভূমিকা: ২-৩ লাইন

10 / 15 / 8

1945 — 24

193

1) Security C...

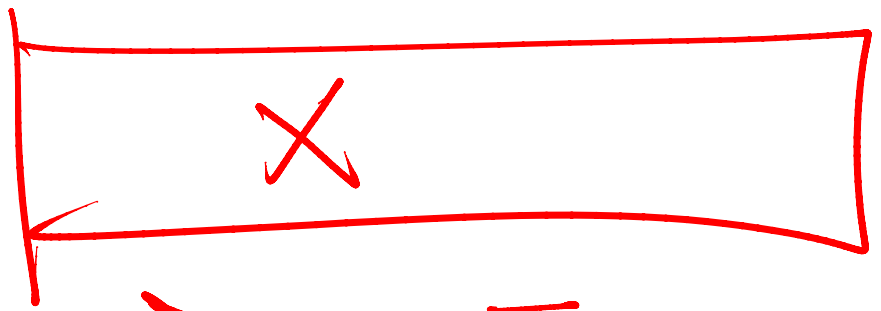

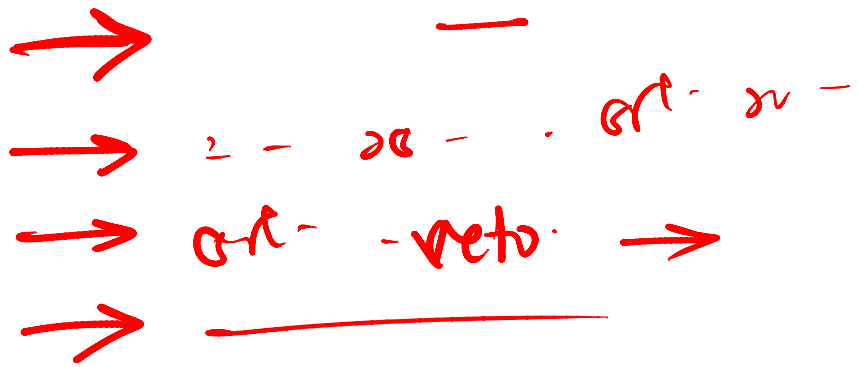

2) Genera...

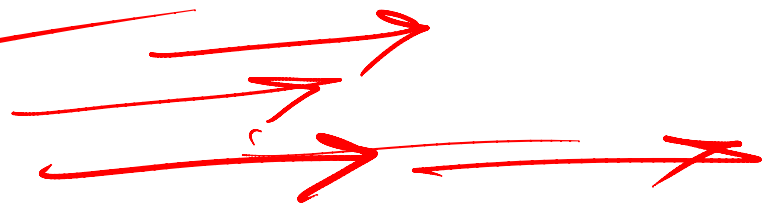

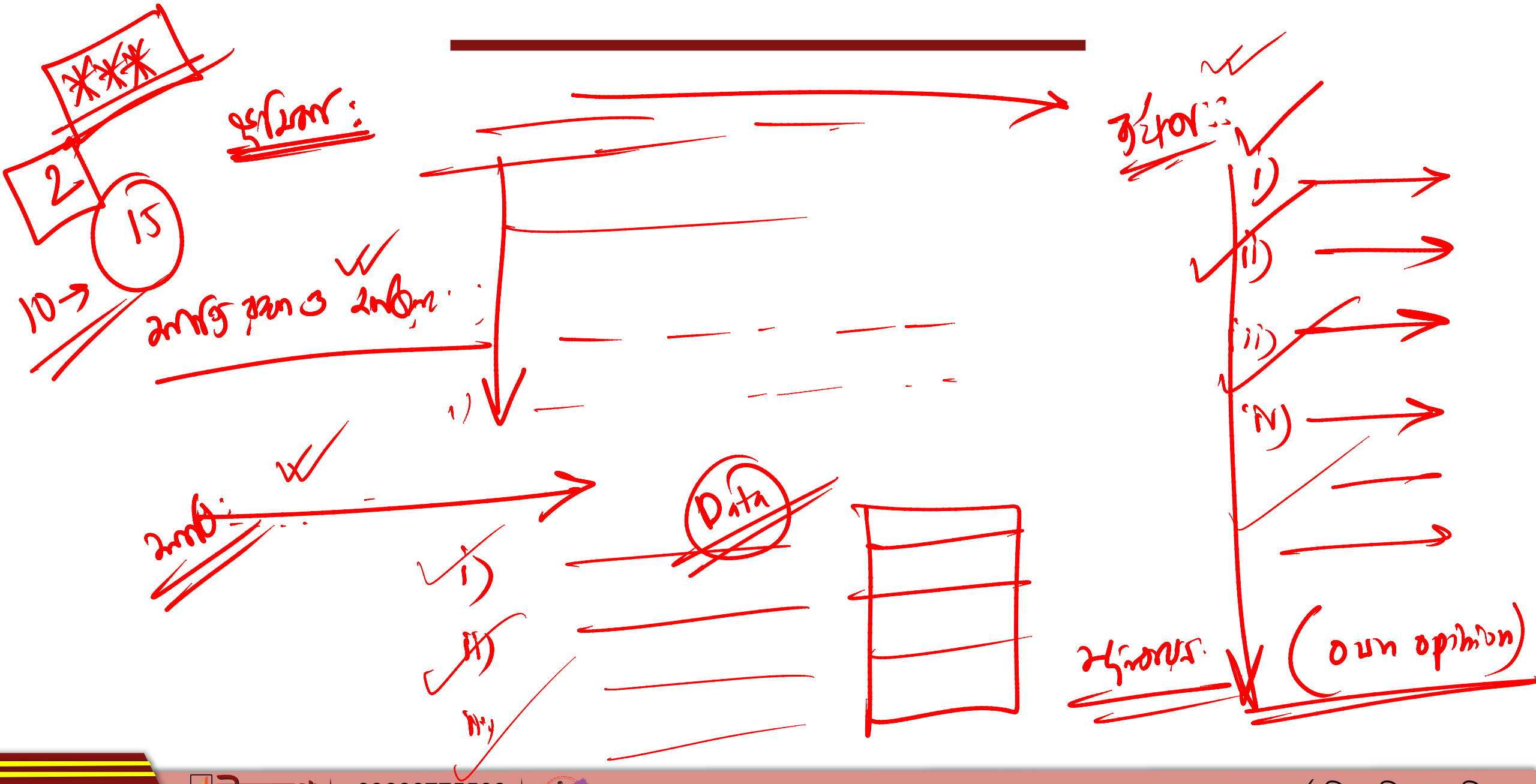
Data

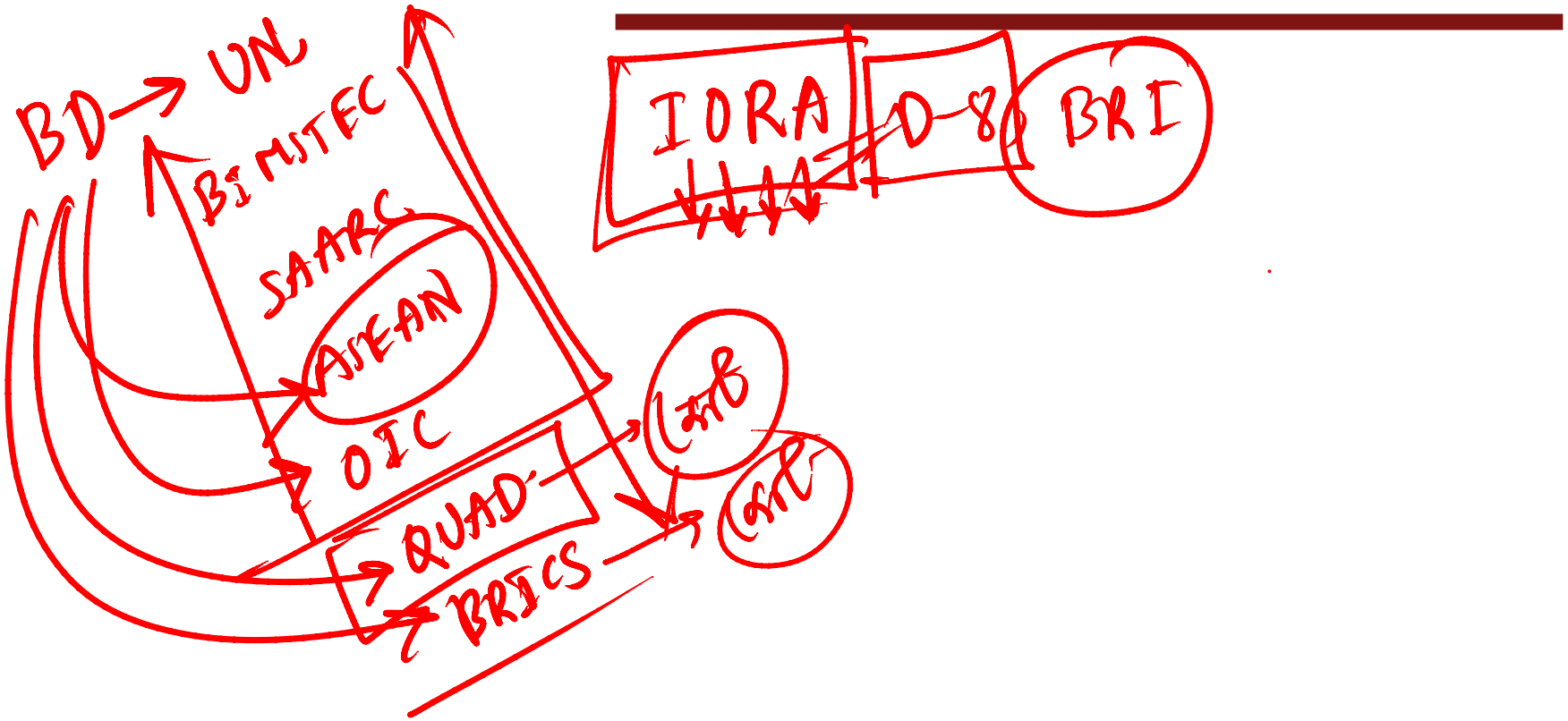
BD
UN
BIMSTEC
SAARC
ASEAN
OIC
QUAD
BRICS
IORA
D-8
BRI

জাতিসংঘ

১
সাধারণ পরিষদ
(The General Assembly)
২
অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ
(Economic and Social Council)
৩
আন্তর্জাতিক আদালত
(International Court of Justice)
৪
নিরাপত্তা পরিষদ
(Security Council)
৫
অছি পরিষদ
(The Trusteeship Council)
৬
জাতিসংঘ সচিবালয়
(United Nations Secretariat)

সাধারণ পরিষদ (The General Assembly)

সাধারণ পরিষদের কার্যাবলি (Functions of the General Assembly) :

জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী সাধারণ পরিষদ এর কার্যাবলি নিম্নরূপ-

- ✓ নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কিত যেকোনো আলোচনা ও সুপারিশ করা।
- ✓ আর্ন্তজাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা সম্পর্কিত যেকোনো আলোচনা, তবে শর্ত থাকে যে, বিষয়টি নিয়ে ইতঃপূর্বে নিরাপত্তা পরিষদে আলোচনা হয়নি, এবং বিষয়টি নিরাপত্তা পরিষদের বিবেচনাধীনও নয়।
- ✓ জাতিসংঘের যেকোনো অঙ্গ সংগঠনের কাজ বা ক্ষমতা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা ও সুপারিশ পেশ করা।
- ✓ আন্তর্জাতিক সহযোগিতা জোরদার করার লক্ষ্যে যেকোনো সুপারিশ পেশ করা, আন্তর্জাতিক আইন উন্নয়ন, মানবাধিকার, ও সবার জন্য মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধির ব্যাপারে সুপারিশ করা।
- ✓ নিরাপত্তা পরিষদসহ সংগঠনের অন্যান্য অঙ্গ সংগঠনের রিপোর্ট গ্রহণ করা ও সেই রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা করা।
- ✓ জাতিসংঘের বাজেট নিয়ে আলোচনা ও তা অনুমোদন করা। সদস্য দেশগুলোর চাঁদার হার নির্ধারণ করা।
- ✓ নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যদের ও সেই সাথে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ এবং অছি পরিষদের সদস্যদের নির্বাচিত করা। নিরাপত্তা পরিষদের সাথে এক সাথে আন্তর্জাতিক আদালতের সদস্যদের নির্বাচিত করা এবং নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশের ভিত্তিতে জাতিসংঘের জন্য একজন মহাসচিব নির্বাচিত করা।
- ✓ আর্ন্তজাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়েছে এমন কোনো কাজে বা দেশের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা পরিষদ যদি কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হয়, তাহলে এ ক্ষেত্রে সাধারণ পরিষদ পদক্ষেপ নিতে পারে।

নিরাপত্তা পরিষদ (Security Council)

নিরাপত্তা পরিষদের গঠন

জাতিসংঘ সনদের ২৩ অনুচ্ছেদে নিরাপত্তা পরিষদের গঠন প্রণালি বর্ণিত হয়েছে। জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী ১৫ সদস্যের সমন্বয়ে নিরাপত্তা পরিষদ গঠিত হবে। এ ১৫ জন সদস্যের মধ্যে ৫ জন স্থায়ী সদস্য এবং বাকি ১০ জন অস্থায়ী সদস্য। স্থায়ী সদস্যগুলো হলো- যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া, ফ্রান্স ও চীন।

অস্থায়ী সদস্য দেশগুলো সাধারণ পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে দুই বছরের জন্য নির্বাচিত হয়। ১০টি অস্থায়ী সদস্যের আঞ্চলিক বণ্টন এ রকম–

অঞ্চল	সদস্য সংখ্যা	অঞ্চল	সদস্য সংখ্যা
এশিয়া মহাদেশ	২টি	পশ্চিম ইউরোপ ও অন্যান্য	২টি
আফ্রিকা মহাদেশ	৩টি	পূর্ব ইউরোপ	১টি
ল্যাটিন আমেরিকা	২টি		

জাতিসংঘ

ভোট ও প্রস্তাব পাশ : নিরাপত্তা পরিষদের প্রত্যেক সদস্যের জন্য একটি করে ভোট রয়েছে। নিরাপত্তা পরিষদের কোনো প্রস্তাব পাস করতে হলে পাঁচটি স্থায়ী সদস্যসহ মোট ৯টি সম্মতিসূচক ভোটের প্রয়োজন হয়। কোনো স্থায়ী সদস্য প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দিলে প্রস্তাবটি নাকচ হয়ে যায়। তবে, স্থায়ী কোনো সদস্য যদি উপস্থিত থেকে ভোট দানে বিরত থাকে তাহলে প্রস্তাব পাশ হবে। কিন্তু উপস্থিত না থাকলে প্রস্তাব পাশ হবে না।

ভেটো প্রদান ক্ষমতা : ভেটো শব্দটি ল্যাটিন ভাষা থেকে আগত, যার অর্থ হচ্ছে আমি মানি না। ভেটো হচ্ছে এক-পক্ষীয়ভাবে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান, সংস্থা, দেশের মনোনীত প্রতিনিধি কর্তৃক কোনো সিদ্ধান্ত বা আইনের উপর স্থগিতাদেশ প্রদান করা। যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, চীন, রাশিয়া এবং ফ্রান্স - এই পাঁচটি দেশ নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য। তারা প্রত্যেকেই ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী। ভেটো ক্ষমতা ব্যবহারের মাধ্যমে যে-কোনো একটি দেশ নিরাপত্তা পরিষদে গৃহীত যে-কোনো ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও আইন প্রণয়ন অনুমোদনে বাধা প্রদান করতে পারে।

নিরাপত্তা পরিষদের দায়িত্ব

নিরাপত্তা পরিষদের দায়িত্ব জাতিসংঘ সনদের ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম ও ১২তম অধ্যায় তথা ২৪, ২৫, ২৮, ৩০ এবং ৪০-৫৪ অনুচ্ছেদে বর্ণনা করা হয়েছে। নিম্নে এর দায়িত্বসমূহ আলোচনা করা হলো:

- ✓ **আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত দায়িত্ব:** আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার প্রাথমিক দায়িত্ব নিরাপত্তা পরিষদের। নিরাপত্তা পরিষদ জাতিসংঘের সকল সদস্যের পক্ষ হতে এ দায়িত্ব পালন করবে।
- ✓ **শান্তি ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ:** আন্তর্জাতিক সংঘাত সৃষ্টিকারী যেকোনো সমস্যা বা অবস্থা সম্পর্কে তদন্ত করা এবং তার মীমাংসার পদ্ধতি সম্পর্কে সুপারিশ করা নিরাপত্তা পরিষদের দায়িত্ব। যদি কোথাও আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়, তাহলে যেকোনো সদস্য দেশ সাধারণ পরিষদের মাধ্যমে বা জাতিসংঘ মহাসচিবের মাধ্যমে তা নিরাপত্তা পরিষদের গোচরে আনতে পারে। জাতিসংঘের সদস্য নয় এরূপ কোনো দেশ বা গোষ্ঠীর সমস্যা সংক্রান্ত বিষয়াদি নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপন করতে পারে। তবে পূর্বে ঐ দেশকে অবশ্যই জাতিসংঘের সনদ বর্ণিত শান্তিপূর্ণ মীমাংসার বাধ্যবাধকতা মেনে নিতে হবে।
- ✓ **শান্তিভঙ্গ ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত দায়িত্ব:** কোথাও শান্তির প্রতি ভীতি প্রদর্শন, শান্তিভঙ্গ বা আগ্রাসনমূলক কার্যকলাপ চিহ্নিত করা গেলে নিরাপত্তা পরিষদ আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে উক্ত বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।
- ✓ **অর্থনৈতিক অবরোধ:** আগ্রাসনকারী দেশের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা পরিষদ অর্থনৈতিক অবরোধসহ অন্যান্য অবরোধ এমনকি প্রয়োজনে বল প্রয়োগে সে দেশকে শান্তি স্থাপনে বাধ্য করার ব্যবস্থাও গ্রহণ করতে পারে।

জাতিসংঘ

- ✓ **সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ:** অন্যান্য ব্যবস্থা অকৃতকার্য হলে নিরাপত্তা পরিষদ প্রয়োজনে সামরিক ব্যবস্থাও গ্রহণ করতে পারে। সেক্ষেত্রে সকল সদস্য দেশ নিরাপত্তা পরিষদকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানে বাধ্য থাকে।
- ✓ **আঞ্চলিক বন্দোবস্ত বিষয়ক দায়িত্ব:** বন্দোবস্তের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধ মীমাংসার জন্য উৎসাহ দান এ পরিষদের একটি দায়িত্ব। বিরোধের সাথে জড়িত রাষ্ট্রের উদ্যোগে বা নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে আঞ্চলিক বন্দোবস্ত বা এজেন্সির মাধ্যমে বিরোধ মীমাংসার ব্যবস্থা করা যায়। আবার নিরাপত্তা পরিষদ নিজের কর্তৃত্বাধীনে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আঞ্চলিক সংগঠন বা সংস্থার সাহায্য গ্রহণ করতে পারে।
- ✓ **অছি বিষয়ক দায়িত্ব:** যে সকল অছি এলাকা সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল হিসেবে শ্রেণিবিভাগ করা হয়েছে, সেগুলোর সকল দায়িত্ব নিরাপত্তা পরিষদের। এসব অছি এলাকার চুক্তি অনুমোদন, সম্পদের উপর অধিকার স্থাপন, রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব স্থাপন, সেগুলোর সকল দায়িত্ব নিরাপত্তা পরিষদের। এসব অছি এলাকার চুক্তি অনুমোদন, পরিবর্তন বা সংশোধনের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা পরিষদ অছি পরিষদের নিকট রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে সহযোগিতা নিতে পারে।
- ✓ **নতুন সদস্য গ্রহণ:** জাতিসংঘের নতুন সদস্য গ্রহণের ক্ষমতা নিরাপত্তা পরিষদের হাতে অর্পণ করা হয়েছে। সাধারণত সবার সাথে যৌথভাবে নিরাপত্তা পরিষদ এ ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকে। নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে সাধারণ পরিষদ নতুন সদস্য গ্রহণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে।
- ✓ **নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব:** নিরাপত্তা পরিষদ ও সাধারণ পরিষদ যৌথভাবে আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারক নির্বাচন করে থাকে। এ পরিষদের সুপারিশ অনুযায়ী সাধারণ পরিষদ মহাসচিব নির্বাচন করে থাকে।
- ✓ **সনদ সংশোধন:** শুধু নিরাপত্তা পরিষদই জাতিসংঘ সনদ সংশোধন, পরিমার্জন বা নতুন আইন অন্তর্ভুক্তকরণ করতে পারে।

নিরাপত্তা পরিষদের দুর্বলতা

নিরাপত্তা পরিষদ জাতিসংঘের শাসন বিভাগ হিসেবে চিহ্নিত। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বহুলাংশে নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীল। সঙ্গত কারণে নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি এরূপ হওয়া দরকার ছিল, যাতে কোনো অবস্থাতেই ন্যায়বিচার বিঘ্নিত না হয়। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি, পরিষদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতিতে অনেক ক্ষেত্রেই ন্যায়বিচার হয়েছে অবহেলিত ও উপেক্ষিত।

ভেটো প্রয়োগের ক্ষমতা নিরাপত্তা পরিষদকে তথা জাতিসংঘকে দুর্বল করেছে এবং অনেক ক্ষেত্রে একে একটি অকার্যকর সংগঠনে পরিণত করেছে। ভেটো প্রয়োগের ক্ষমতার কারণে বৃহৎ পঞ্চশক্তি যে বিষয়ে একমত হয়, কেবল সে বিষয়েই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব। বিশ্বের সর্বত্র সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত সিদ্ধান্ত গ্রহণের যোগ্য মাপকাঠি ধরা হলেও নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়নি। নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে একটিমাত্র স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রের ভেটো প্রয়োগের ফলে অবশিষ্ট ৪টি স্থায়ী সদস্যরাষ্ট্র ও ১০টি অস্থায়ী সদস্যের মতামত বাতিল হয়ে যেতে পারে। ফলে এ ভেটো ক্ষমতার কারণে নিরাপত্তা পরিষদ তার দায়িত্ব পালনে অনেক ক্ষেত্রেই দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিচ্ছে।

শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধ মীমাংসার যে দায়িত্ব নিরাপত্তা পরিষদের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে, সে দায়িত্ব পালনে পরিষদ ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। বৃহৎ শক্তির মদদপুষ্ট কোনো বিরোধের মীমাংসা নিরাপত্তা পরিষদ আজ পর্যন্ত দিতে পারেনি। ভিয়েতনাম ও মধ্যপ্রাচ্যের ঘটনাবলি তার প্রমাণ। ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগের কারণে বিশ্বের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়/প্রস্তাব সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হয়নি। ফলে ব্যর্থ হয়েছে নিরাপত্তা পরিষদের উদ্যোগ।

জাতিসংঘ

উদাহরণস্বরূপ-

- ✓ রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে পারছে না।
- ✓ চলমান ইসরায়েল কর্তৃক ফিলিস্তিনিদের উপর হত্যাযজ্ঞ নিয়ে নিরাপত্তা পরিষদ কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না।
- ✓ গণচীনের ভেটোর কারণে বাংলাদেশ স্বাধীনতার পর পরই জাতিসংঘের সদস্যপদ পায়নি।
- ✓ রোহিঙ্গা ইস্যুতে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ জাতিসংঘ নিতে পারেনি।
- ✓ সিরিয়ায় আসাদ সরকারের তাণ্ডবের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা পরিষদ কোনো ভূমিকা নিতে পারেনি।
- ✓ ইয়েমেনে হুতিদের নৃশংসভাবে সৌদি হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা পরিষদ নির্বাক।
- ✓ ১৯৮৬ সালে যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক লিবিয়ার উপর আক্রমণ এবং দক্ষিণ আফ্রিকা কর্তৃক বতসোয়ানা, জাম্বিয়া ও জিম্বাবুয়ের উপর আক্রমণের নিন্দা প্রস্তাব মার্কিন ভেটোর কারণে নিরাপত্তা পরিষদে গৃহীত হয়নি।
- ✓ জাতিসংঘ মহাসচিব বুট্রোস ঘালির পুনঃনির্বাচন মার্কিন ভেটোর কারণে সম্ভব হয়নি।
- ✓ কোরিয়া যুদ্ধ, আরব-ইসরায়েল যুদ্ধ, প্যালেস্টাইন যুদ্ধ প্রভৃতি বহু ঘটনার নিষ্পত্তি কেবল ভেটোর কারণে বাস্তবতার মুখ দেখেনি।

নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কার

জাতিসংঘ সনদের ২৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জাতিসংঘ গঠন ও কার্যপ্রণালি নির্ধারিত হয়। ১৯৬৫ সালের পর ২০১৫ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে অনুষ্ঠিত হয় সংস্কার বৈঠক। ভারত, জার্মানি ও জাপান এই বৈঠকে সংস্কার প্রস্তাব উত্থাপন করে। প্রতিষ্ঠার ৭০ বছর পরও সংস্থাটির কার্যকারিতায় কিছু সমস্যা রয়েছে। তাই সংস্কার করা জরুরি। যেসব বিষয়ের কারণে সংস্কার হওয়া জরুরি–

- **নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য বৃদ্ধি:** নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী সদস্য সংখ্যা মাত্র ৫টি। দেখা যায় এখানে ৭৬ কোটি মানুষের ইউরোপ মহাদেশ থেকে ৩টি সদস্য, আর ৩৮৫ কোটি মানুষের মহাদেশ এশিয়া থেকে স্থায়ী সদস্য ১টি এবং ৮৬ কোটি মানুষের মহাদেশ আফ্রিকার কোনো স্থায়ী সদস্যই নেই। তাই সংস্কার করে মহাদেশভিত্তিক প্রতিনিধি বৃদ্ধি জরুরি।

- **সদস্যের অনুপাতে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি:** ১৯৪৫ সালে প্রতিষ্ঠার সময় জাতিসংঘের সদস্য সংখ্যা ছিল ৫১টি আর তখন নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য সংখ্যা ছিল ১১টি তার মধ্যে ৫টি স্থায়ী ও ৬টি অস্থায়ী। ১৯৬৫ সালে প্রথম সংশোধন করে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য সংখ্যা করা হয় ১৫টি। বর্তমানে জাতিসংঘের মোট সদস্য সংখ্যা ১৯৩টি। দীর্ঘ প্রায় ৬৮ বছর যাবৎ জাতিসংঘের সবচেয়ে কার্যকর এ পরিষদের তেমন কোনো পরিবর্তন করা হয়নি। বিশেষ করে বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং একবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে বিশ্ব রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়ে।

জাতিসংঘ

- **নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যপদে মুসলিম দেশের প্রতিনিধি রাখা:** নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচটি স্থায়ী সদস্য হলো যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, রাশিয়া ও চীন। পৃথিবীর ১৬০ কোটি মুসলিমের মধ্যে একটি দেশেরও প্রতিনিধিত্ব নেই। তাই সংস্কার করে মুসলিম কোনো দেশকে প্রতিনিধিত্বের সুযোগ দেয়া উচিৎ।

- **ভেটোর সংস্কার:** বর্তমান ভেটো পদ্ধতিতে স্থায়ী সদস্যের কোনো একটি সদস্য আপত্তি জানালেই প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়। এটিকে সংস্কার করে সংখ্যার সীমাবদ্ধতায় নিয়ে আসা উচিত। যেমন, দুই-তৃতীয়াংশ বা তিন-চতুর্থাংশ ভোটের ভিত্তিতে পাশ করার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

- **সাধারণ পরিষদের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা:** জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্রের অংশগ্রহণের একমাত্র ক্ষেত্র হলো সাধারণ পরিষদ। সদস্য রাষ্ট্রসমূহ একমাত্র সাধারণ পরিষদেই সর্বজনীনভাবে অংশ নিতে পারে। কিন্তু নিরাপত্তা পরিষদের ভেটোর কারণে সাধারণ পরিষদ তেমন কোনো কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে না। এ কারণেই জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদকে আরও কার্যকর করা দরকার।

- **মহাসচিবের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা:** জাতিসংঘের সর্বোচ্চ কর্তা ব্যক্তি হিসেবে জাতিসংঘের মহাসচিবের যেরূপ ক্ষমতা থাকার প্রয়োজন ছিল, তা মহাসচিবের নেই। নিরাপত্তা পরিষদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকে তিনি অগ্রাহ্য করতে পারেন না। এছাড়া বৃহৎ শক্তিগুলোর বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের স্বেচ্ছাচারিতার মোকাবিলায় তিনি চরমভাবে ব্যর্থ। তাই জাতিসংঘ সনদের সংস্কারের মাধ্যমে তার ক্ষমতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

জাতিসংঘ

- **শান্তি প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থতা:** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর শান্তির নিরাপত্তা আর সমৃদ্ধির মহান ব্রত নিয়ে জাতিসংঘের জন্ম হয়েছিল। সম্প্রতি বিশ্বব্যাপী অশান্তি আর আধিপত্যবাদ তা মিথ্যা প্রমাণ করছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো পৃথিবীকে তাদের নিজ স্বার্থে নতুন রূপ দিতে গিয়ে বিবাদে জড়িয়ে পড়ে এবং সত্তর কিংবা আশির দশকের পর হতে দেশে দেশে জাতিগত দ্বন্দ্ব শুরু হয়। তাছাড়া একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসবাদের যে উত্থান তা মোকাবিলায় জাতিসংঘের বর্তমান ব্যবস্থাপনা ও কাঠামো সম্পূর্ণ রূপে ব্যর্থ হচ্ছে। কারণ তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও নীতিসমূহ পরিবর্তিত বিশ্ব ব্যবস্থার সাথে খাপ খাওয়াতে সক্ষম হচ্ছে না।
- **ত্রুটিপূর্ণ চাঁদা পদ্ধতি:** বিশ্বের সর্ববৃহৎ বৈধ রাজনৈতিক সংস্থা হওয়া সত্ত্বেও জাতিসংঘের অর্থনৈতিক দৈন্যদশা রয়েছে। জাতিসংঘের প্রধান আয় হচ্ছে সদস্য রাষ্ট্রসমূহের চাঁদা। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ কতিপয় দেশের চাঁদার উপর নির্ভরশীল সংস্থাটি এদের হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছে। এছাড়া সদস্য রাষ্ট্রসমূহ রীতিমত চাঁদা পরিশোধ না করায় ক্ষুধা, দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা কঠিন হয়ে যাচ্ছে। তাই অর্থনৈতিক কারণেও জাতিসংঘের সংস্কার আবশ্যক।
- **মার্কিন সাহায্য নির্ভরতা:** জাতিসংঘের বাজেটের এক-চতুর্থাংশই দেয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা বাহিনীর মোট খরচেরও এক-চতুর্থাংশ দেয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এসব কারণে জাতিসংঘ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর আর্থিকভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। জাতিসংঘের মার্কিন সাহায্য যদি বন্ধ হয়ে যায় তবে জাতিসংঘ হুমকির মুখে পড়বে। তাই সংস্কারের মাধ্যমে জাতিসংঘে মার্কিন নির্ভরতা কমাতে হবে। ২০১৮ সালে জেরুজালেম ইস্যুতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প চাঁদা বন্ধ করে দেয়ার হুমকি দিয়েছিল।

আন্তর্জাতিক আদালত (International Court of Justice)

আন্তর্জাতিক আদালত ১৫ জন বিচারকের সমন্বয়ে ৯ বছরের জন্য গঠিত হয়। সাধারণ ও নিরাপত্তা পরিষদ পৃথক অধিবেশনে আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারক নির্বাচিত করে। বিচারকরা একমাত্র যোগ্যতার মাপকাঠিতেই নির্বাচিত হন। কোনো প্রকার জাতীয়তার ভিত্তিতে নয়। তবে একই রাষ্ট্রের একসঙ্গে দু'জন বিচারক নির্বাচিত হতে পারবেন না। মেয়াদান্তে বিচারকগণ পুনঃনির্বাচিত হতে পারেন। বিচারকগণ তাদের মধ্য থেকে ৩ বছরের জন্য একজন সভাপতি ও একজন সহ-সভাপতি নির্বাচিত করেন। আদালতের কার্যক্রমে ৯ জন বিচারপতির উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হয়।

আন্তর্জাতিক আদালতের কার্যাবলি (Functions of International Court of Justice)

- **আবেদনমূলক বিষয়ে এখতিয়ার বা কার্যাবলি:** জাতিসংঘের কোনো সদস্য রাষ্ট্র যদি অপর কোনো সদস্য রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করে এবং সে বিষয়ে ন্যায়সঙ্গত মীমাংসার জন্য আবেদন করে, তাহলে আন্তর্জাতিক আদালত সে বিষয়ে আন্তর্জাতিক আইন প্রয়োগের মাধ্যমে ন্যায়সঙ্গত মীমাংসামূলক রায় প্রদান করে থাকে।
- **জাতিসংঘ সনদের অন্তর্ভুক্ত বিষয়ে এখতিয়ার:** জাতিসংঘ সনদের অন্তর্ভুক্ত কোনো বিষয় নিয়ে যদি কোনো বিবাদ দেখা দেয়, তাহলে আন্তর্জাতিক আদালত উক্ত বিরোধের আইনগত মীমাংসা প্রদান করে তা প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে।
- **সন্ধি বা চুক্তিবিষয়ক কার্যাবলি:** জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে যদি কোনো বিবাদ দেখা দেয়, তাহলে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রদ্বয়ের সম্মতিক্রমে আদালত এর যথাযথ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করে।
- **উপদেশমূলক এখতিয়ার:** আন্তর্জাতিক আইনবিষয়ক যেকোনো বিষয়ে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ অথবা নিরাপত্তা পরিষদ যদি আন্তর্জাতিক আদালতের নিকট উপদেশ কামনা করে তাহলে আদালত উক্ত বিষয়ে উপদেশ প্রদানে এগিয়ে আসে।

জাতিসংঘের সাফল্য ও ব্যর্থতা

জাতিসংঘের সাফল্য

আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় এ পর্যন্ত ৭১টি শান্তি মিশনের (১৬টি চলমান) মাধ্যমে –

- ✓ ১৯৪৮ সালে ফিলিস্তিন যুদ্ধ বন্ধ করা।
- ✓ ১৯৫৬ সালে সুয়েজ খাল সংকট মোকাবিলা।
- ✓ ১৯৯১ সালে ইরাক-কুয়েত সংকট মোকাবিলা।
- ✓ ১৯৫০ সালে কোরিয়া সংকট মোকাবিলা।
- ✓ ১৯৮৮ সালে ইরাক-ইরান যুদ্ধ বন্ধ করা।

জাতিসংঘের সাফল্য ও ব্যর্থতা

- **উপনিবেশ বিলোপ ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা:** জাতিসংঘ কম্বোডিয়া, নামিবিয়া, এল সালভাদর, ইরিত্রিয়া, মোজাম্বিক, নিকারাগুয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, পূর্ব তিমুরসহ ৪৫টি দেশে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন করাতে সক্ষম হয়েছে। জাতিসংঘ প্রায় ৫০টি দেশের স্বাধীনতা অর্জনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। ইথিওপিয়া ও ইরিত্রিয়ার ত্রিশ বছরব্যাপী সংঘর্ষের পর ইরিত্রিয়ার স্বাধীনতা অর্জনে এবং সুদানের স্বাধীনতা দেওয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।
- **মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়ন:** ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র গৃহীত হয়। ১৯৪৮ সালে সর্বজনীন মানবাধিকার সনদের পর রাজনৈতিক, নাগরিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত ৮০টি চুক্তি সম্পন্ন করেছে।
- **নারী-পুরুষ বৈষম্যরোধ:** ১৯৭৯ সালে CEDAW (Convention of the Elimination of All Forms of Discrimination Against women) প্রতিষ্ঠা হয় এবং কার্যকর হয় ১৯৮১ সালে।
- **সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে:** জাতিসংঘ UNDP, UNICEF, ECOSOC ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করে। ECOSOC-এর মাধ্যমে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাফল্য পেয়েছে এবং এসব কার্যক্রমে ECOSOC, ১৫টি বিশেষ সংস্থা ও বিভিন্ন কমিশন বিশেষ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

জাতিসংঘের সাফল্য ও ব্যর্থতা

- **পরিবেশ সংরক্ষণ**
  - ✓ ১৯৯২ সালে রিও ডি জেনিরোয় জাতিসংঘের উদ্যোগে ধরিত্রী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।
  - ✓ ২০০২ সালে জোহানেসবার্গে অনুষ্ঠিত টেকসই উন্নয়নের ওপর জাতিসংঘ ধরিত্রী সম্মেলনের মূল বিষয় ছিল দারিদ্র্য দূরীকরণ।
  - ✓ প্যারিস সম্মেলনে-১৯৬টি দেশ পরিবেশের উন্নয়ন ও কৌশলপত্র নিয়ে আলোচনা করে।
- **পরমাণু বিস্তার রোধ সংক্রান্ত চুক্তি:** ১৯৫৭ সালে IAEA, ১৯৬৮ সালে NPT, ১৯৯৬ সালে CTBT (৯০টি দেশে পরমাণু চুল্লি পরিদর্শন করে)
- **আন্তঃনিয়ন্ত্রণাধিকার ও স্বনির্ভরতা:** জাতিসংঘ প্রায় ৮০টি সদস্যদেশের স্বনির্ভরতা অর্জনে ভূমিকা পালন করে।
- **আন্তর্জাতিক আইন জোরদার:** তিন শতাধিক আন্তর্জাতিক চুক্তি আইনে পরিণত হয়েছে। মানবাধিকার সনদ থেকে মহাকাশ ও সমুদ্র তলদেশে পরমাণু সরঞ্জাম ব্যবহার সংক্রান্ত চুক্তি সম্পন্ন করেছে।
- **আন্তর্জাতিক বিরোধের নিষ্পত্তি:** ইরানের পরমাণু চুক্তি
- **বর্ণবৈষম্যের অবসান:** সাধারণ পরিষদ এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- **উন্নয়নে অবদান:** MDG, SDG, UNDP প্রতিষ্ঠা।

জাতিসংঘের সাফল্য ও ব্যর্থতা

জাতিসংঘের ব্যর্থতা

- **রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ থামাতে ব্যর্থতা:** রাশিয়া-ইউক্রেনে চলমান যুদ্ধ থামানোর জন্য জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে প্রস্তাব উত্থাপন করলেও পঞ্চশক্তির ভেটো ক্ষমতায় তা ব্যর্থ হয়। আন্তর্জাতিক সংগঠন হওয়া সত্ত্বেও জাতিসংঘ এ সমস্যার সমাধান করতে ব্যর্থ হয়েছে। যার কারণে সারা বিশ্ব এখন এর ফল ভোগ করছে।
- **রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ:** দীর্ঘ ৬ বছর ধরে বাংলাদেশ ১১.৫ লাখ রোহিঙ্গাদের বহন করে চলছে। জাতিসংঘের প্রতিটি অধিবেশনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রোহিঙ্গা সমস্যা উত্থাপন করলেও জাতিসংঘ রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে এখনো যথাযথ পদক্ষেপ নিতে পারছে না।
- **কাশ্মীর সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ:** ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর থেকে এখন পর্যন্ত কাশ্মীর সমস্যার সমাধান করতে পারেনি জাতিসংঘ। কাশ্মীর নিয়ে এখনো ভারত, চীন ও পাকিস্তানের মাঝে দ্বন্দ্ব চলমান।
- **নির্বিচারে গণহত্যা রোধে ব্যর্থতা:** বসনিয়া হার্জেগোভিনা, কসোভো, আফগানিস্তান, ইরাক, চেচনিয়া এবং বাংলাদেশে নির্বিচারে গণহত্যা রোধে জাতিসংঘ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।

জাতিসংঘের সাফল্য ও ব্যর্থতা

➢ **মানবাধিকার সংরক্ষণে ব্যর্থতা:** বিভিন্ন অঞ্চলে জাতিসংঘের নীরব বা প্রত্যক্ষ ভূমিকায় শান্তি প্রতিষ্ঠার নামে মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছে। অনেক দেশের বিরুদ্ধে বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করে। যেমন- ইরাকের বিরুদ্ধে অবরোধ আরোপ করায় খাদ্য ও ঔষধের অভাবে শিশুমৃত্যু মানবাধিকার লঙ্ঘনে ভূমিকা রেখেছে, যা বিশ্বব্যাপী সমালোচিত হয়েছে।

➢ **মধ্যপ্রাচ্য সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ-**

❖ **মধ্যপ্রাচ্য:** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৭ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ফিলিস্তিনি ভূ-খণ্ড দ্বিখণ্ডিত করা সংক্রান্ত ১৮১ নম্বর প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯৬৭ সালের নভেম্বরে আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের পর নিরাপত্তা পরিষদ ২৪২ নং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল অধিকৃত ভূ-খণ্ড ছেড়ে দেওয়া কিন্তু ইসরায়েল ছাড়েনি। নিম্নোক্ত সমস্যা সমাধানে জাতিসংঘ ব্যর্থ হয়েছে –

✓ আরব বসন্ত (২০১১),
✓ সিরিয়া সংকট (২০১১-বর্তমান),
✓ কুয়েত সংকট ১৯৯০ (ইরাক কর্তৃক আক্রমণ)
✓ আফগান সংকট ১৯৭৯-১৯৮৯ (USSR কর্তৃক আক্রমণ)
✓ আগ্রাসন-রোধ (ইরাক)।
✓ উপসাগরীয় যুদ্ধের পর জাতিসংঘ ইরাকের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করে কিন্তু কাজে আসেনি।
✓ ২০০৩ সালে জাতিসংঘকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ইরাকে হামলা করে।

গণহত্যা (GENOCIDE)

১৯৪৮ সালে জাতিসংঘের Genocide Convention এর ২(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, নিম্নোক্ত ৫টি অপরাধ গণহত্যা–

- ✓ কোনো জাতি বা সম্প্রদায়কে মেরে ফেলা
- ✓ শারীরিক বা মানসিকভাবে কোনো গ্রুপের মানুষদের প্রচণ্ড ক্ষতিসাধন করা।
- ✓ ইচ্ছাকৃতভাবে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করা, যাতে করে কোনো জাতি সম্পূর্ণ বা আংশিক ধ্বংস হয়ে যায়।
- ✓ ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো গোষ্ঠীর জন্য জন্ম নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বাধ্যতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- ✓ জোরপূর্বক ঐ জাতিগোষ্ঠীর বাচ্চাদের অন্য জাতিগোষ্ঠীতে প্রেরণ করা।

গণহত্যা সংক্রান্ত আইন

১৯৪৬ সালে জাতিসংঘে গণহত্যা সংক্রান্ত একটি ঐতিহাসিক প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং গণহত্যা সংক্রান্ত একটি আন্তর্জাতিক আইন প্রণয়নের জন্য আলোচনা শুরু হয়। অবশেষে ১৯৪৮ সালের, ৯ ডিসেম্বর The Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (CPPCG), or Genocide Convention নামে গণহত্যার সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞাসহ একে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করে সদস্য রাষ্ট্রসমূহকে গণহত্যা রোধে পদক্ষেপ নেওয়ার ব্যাপারে বাধ্যবাধকতা দেয়। এটিই ইতিহাসে গণহত্যাকে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করার প্রথম পদক্ষেপ এবং জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ দ্বারা গৃহীত মানবাধিকার সম্পর্কিত প্রথম কোনো সর্বজনীন চুক্তি। এই আইনটি ১৯৫২ সালের, ১২ জানুয়ারি থেকে কার্যকর হয়।

সর্বজনীন মানবাধিকার (UNIVERSAL HUMAN RIGHTS)

১৯৪৮ সালের, ১০ ডিসেম্বর ফ্রান্সের প্যারিসে সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা গ্রহণ করা হয়। মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রে Cranston বলেছেন 'মানবাধিকার হলো এমন এক অধিকার, যা ন্যায়বিচার বা আইনের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন না করলে ছিনিয়ে নেওয়া বা হরণ করা যায় না।'

জেনেভা কনভেনশন ও এর মূল উদ্দেশ্য

জেনেভা কনভেনশন (Geneva Convention): ১৯৪৯ সালের ১২ আগস্ট বিশ্বের ৫৮টি দেশ সুইজারল্যান্ডের জেনেভা শহরে যুদ্ধবন্দি ও যুদ্ধাহতদের সঙ্গে আচরণবিধি ও সহযোগিতা প্রদান সম্পর্কে চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এতে প্রথম তিনটি জেনেভা কনভেনশনের পরিমার্জন ও সম্প্রসারণ করা হয় এবং এতে চতুর্থ কনভেনশনটি যোগ করা হয়।

ক্রমিক	সাল	উদ্দেশ্য
প্রথম	১৮৬৪	যুদ্ধক্ষেত্রে আহত ও অসুস্থ সৈন্যদের অবস্থার সার্বিক উন্নতি।
দ্বিতীয়	১৯০৬	সমুদ্রস্থ যুদ্ধক্ষেত্রে আহত, অসুস্থ এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত জাহাজের সৈন্যদের অবস্থার সার্বিক উন্নতি।
তৃতীয়	১৯২৯	যুদ্ধবন্দিদের প্রতি আচরণ ও তাদের নিরাপত্তা ও চিকিৎসা নিশ্চিত করা।
চতুর্থ	১৯৪৯	যুদ্ধাবস্থায় বেসামরিক জনগণকে রক্ষার জন্য সম্পাদিত চতুর্থ কনভেনশনকে চারটি রেড ক্রস কনভেনশন নামেও ডাকা হয়।

নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণে জাতিসংঘের ভূমিকা

নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য বিলোপ সনদ বা সিডো (CEDAW)

- ✓ CEDAW এর পূর্ণরূপ Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women.
- ✓ নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য বিলোপ সনদটি সিডো সনদ নামে পরিচিত, যা ১৯৭৯ সালের, ডিসেম্বর মাসে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত হয়।
- ✓ ১৯৮১ সালে ২০টি দেশ সমর্থন করার পর এটি কার্যকর হয়।
- ✓ বাংলাদেশসহ মোট ১৩২টি দেশে বর্তমানে এ সনদটি কার্যকর আছে।
- ✓ এই সনদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, এটি নারীর অধিকারের একটি পূর্ণাঙ্গ দলিল, যা বিভিন্ন সময় নারীর প্রতি বৈষম্য নিরসনে গ্রহণকৃত বিভিন্ন ইস্যুকে সমন্বিত করে।

নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণে জাতিসংঘের ভূমিকা

নারীর প্রতি বৈষম্যের ক্ষেত্রে সিডো সনদের ভূমিকা

- ✓ নারী ও পুরুষের সমতার নীতির ওপর ভিত্তি করে সনদটি প্রতিষ্ঠিত।
- ✓ নারীর মানবাধিকার বিষয়টিও উঠে এসেছে।
- ✓ বিভিন্ন দেশে নারীর আইনগত অধিকার থাকলেও বৈষম্য রয়েছে এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে নারীর প্রবেশাধিকার খর্ব করা হয়েছে। এটি এই সনদে স্বীকার করা হয়।
- ✓ এই সনদ নারীর প্রতি রাষ্ট্রের দায়িত্ব নিশ্চিত করে। সিডো সনদে ৩০টি ধারা আছে।
- ✓ প্রথম ১৬টি নারীর প্রতি বৈষম্য কত প্রকারের আছে তা আলোচনা করে।
- ✓ বাকি ১৪টি ধারা ব্যাখ্যা করে এ বৈষম্যগুলো কীভাবে বিলোপ করা যায়।
- ✓ নারীর নির্যাতন প্রতিরোধে ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ২৫ নভেম্বরকে আন্তর্জাতিক 'নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস' হিসেবে পালনের ঘোষণা দেওয়া হয়।
- ✓ নারী অধিকার সুরক্ষার জন্য জাতিসংঘ ৮ মার্চকে বিশ্ব 'নারী দিবস' হিসেবে ঘোষণা করেছে।

নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণে জাতিসংঘের ভূমিকা

প্লাটফর্ম ফর অ্যাকশন

প্লাটফর্ম ফর অ্যাকশন হচ্ছে বিশ্বে নারীসমাজের অগ্রগতির জন্য একটি নীলনকশা যা চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনের মাধ্যমে গৃহীত হয়। এটি ৪৯তম অধিবেশনের ৩৬১ অনুচ্ছেদের এ খসড়া অনুমোদন করা হয়।

বেইজিং সম্মেলন: ১৯৯৫ সালে বেইজিং সম্মেলনে জাতিসংঘের তৎকালীন ১৮৯টি সদস্যরাষ্ট্রের নেতারা অংশগ্রহণ করেন। সদস্যরাষ্ট্রগুলো নারী উন্নয়ন নীতিমালার রৈখিক রূপরেখা হিসেবে 'প্ল্যাটফর্ম ফর অ্যাকশন' পূর্ণ অনুমোদন করে এবং এর আলোকে নিজ নিজ দেশের নারী উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়ন করে তা জাতীয় পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। এ পরিকল্পনায় নারী উন্নয়নের জন্য ১২টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের তালিকা করা হয়। বিষয়গুলো হলো:

✓ নারীদের দারিদ্র্য	✓ মানবাধিকার	✓ গণমাধ্যম
✓ ক্ষমতা বণ্টন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ	✓ স্বাস্থ্য	✓ সশস্ত্র ও অন্যান্য সংঘাত
✓ শিক্ষা	✓ নারীদের উপর নির্যাতন	✓ পরিবেশ ও উন্নয়ন
✓ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মেশিনারি	✓ কন্যাশিশু	✓ অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ

এই দলিলের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, এখানে গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যেকটি বিষয়ে বর্তমান বিশ্বে নারীর অবস্থানকে চিহ্নিত করা হয়েছে। তারপর সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে অত্যন্ত সুনির্দিষ্টভাবে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে সরকার, কিছু সংস্থা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ওপর।

পরিবেশ সংরক্ষণে জাতিসংঘ

- ‘এজেন্ডা-২১’ যা চূড়ান্ত করা হয় ১৯৯২ সালে, পরিবেশ ও উন্নয়ন সম্পর্কিত জাতিসংঘ সম্মেলনে (ধরিত্রী শীর্ষ সম্মেলন), তাতে পরিবেশ-বান্ধব উন্নয়নের একটি ভূমণ্ডলীর নীল নকশা তুলে ধরা হয় এবং এই কর্মসূচির সাথে সঙ্গতি রেখে বহু দেশ তাদের নিজস্ব ও স্থানীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ১৯৯৭ সালে গৃহীত এক পর্যালোচনায় দেখা যায়– পানি, বনভূমি, বিশ্বের উষ্ণতা এবং প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রভৃতির ন্যায় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আরও শক্তিশালী উদ্যোগ গ্রহণ জরুরি হয়ে পড়েছে।
- টেকসই উন্নয়ন বিষয়ক জাতিসংঘ কমিশন ‘টেকসই উন্নয়ন’এর জন্য প্রয়োজনীয় সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের তাগিদ দিয়েছে। এ হলো এমন এক কর্ম উদ্যোগ যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সম্পদ সংরক্ষণের নিশ্চয়তা দেয়।
- পরিবেশগত চুক্তিসমূহ কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কী না কমিশন তা পর্যালোচনা করে এবং টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে কর্মরত সরকার ও প্রধান প্রধান বেসরকারি গ্রুপকে নীতি নির্ধারণীমূলক উপদেশ দিয়ে থাকে। অগ্রগতির মাত্রা নিরূপণকারী তথ্য-উপাত্ত দিয়ে সরকারসমূহকে সাহায্য করার পাশাপাশি টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সূচক বা আদর্শ প্রণয়নে কমিশন কাজ করে চলেছে। ১০০টিরও বেশি দেশ টেকসই উন্নয়ন কমিশন অথবা অনুরূপ সমন্বয়কারী সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে।

পরিবেশ সংরক্ষণে জাতিসংঘ

- জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (UNEP) পরিবেশের আরও উত্তম ব্যবস্থাপনা, পৃথিবীর স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ এবং আন্তর্জাতিক চুক্তি প্রণয়নে মধ্যস্থতা- প্রভৃতির মাধ্যমে দেশসমূহকে সহায়তা প্রদান করে চলেছে।
- জাতিসংঘ কর্তৃক পরিচালিত কারিগরি সংস্থাগুলো পরিবেশের গতি-প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করছে। জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (UNEP)- এর ভূমণ্ডলীয় পরিবেশ পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা (Global Environment Monitoring System) মহাসাগর, বায়ুমণ্ডল দূষণ এবং পুনঃব্যবহারযোগ্য সম্পদের ন্যায় পরিবেশগত। মৌলিক বিষয়াবলীয় সূচক পর্যবেক্ষণ করে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) পর্যবেক্ষণ করে ভূমণ্ডলীয় মৎস্য সম্পদের মজুদ এবং সীমাবহির্ভূত মাত্রায় মৎস্য সম্পদের মজুদ এবং সীমাবহির্ভূত মাত্রায় মৎস্য আহরণের বিপদ সম্পর্কে সরকারগুলোকে সাবধান করে। ১৩০টি দেশ থেকে নেয়া প্রায় ২০০০ বিজ্ঞানীকে নিয়ে গঠিত আবহাওয়া পরিবর্তন বিষয়ক আন্তঃসরকার প্যানেলের (Intergovernmental Panel on Climate Change) কাজ হচ্ছে বিশ্বের পরিবর্তনশীল আবহাওয়া এবং বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা বর্ধনজনিত প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কিত প্রকল্প বা কর্মসূচি বাস্তবায়নে বহুপাক্ষিক ঋণের সর্ববৃহৎ উৎস।

জাতিসংঘের অধীনে শান্তিরক্ষা

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রম

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রম ৩টি পদ্ধতিতে হয়ে থাকে –

- ✓ অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা (Arms Embargo)
- ✓ অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা (Economic Sanction)
- ✓ শক্তি প্রয়োগ (Use of Force)

সৈন্য প্রেরণে ৩টি শর্ত –

- ✓ যে দেশে প্রেরণ হবে তার অনুমতি,
- ✓ নিরাপত্তা পরিষদের অনুমতি,
- ✓ যে দেশগুলো স্বেচ্ছায় সৈন্য প্রেরণ করবে তার সম্মতি।

জাতিসংঘের অধীনে শান্তিরক্ষা

আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষী বাহিনীর ভূমিকা

- **নিরাপত্তায়:** কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চল বা জাতি যাতে যুদ্ধে নিজেদের সম্পৃক্ত না করে, সেজন্য সেখানে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী মোতায়েন করে। শান্তিরক্ষী বাহিনী ঐ অঞ্চলের একটি নিরাপত্তা দেয়াল হিসেবে কাজ করে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে শান্তিরক্ষী বাহিনী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- **ঐকমত্য স্থাপনে:** শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের অন্যতম প্রধান ভূমিকা হলো বিবদমান দুই পক্ষের মধ্যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করা, যাতে সব ধরনের বিবাদ মিটিয়ে সম্পূর্ণরূপে সমঝোতায় পৌঁছানো যায়।
- **মধ্যবর্তী বাহিনীর দায়িত্ব পালন:** শান্তিরক্ষী বাহিনী বিরোধপূর্ণ অঞ্চলে মধ্যবর্তী বাহিনীর দায়িত্ব পালন করে, যাদের বাফার বাহিনীও বলা হয়ে থাকে। এর ফলে উভয় পক্ষের মধ্যে এক ধরনের সমঝোতা চলে আসে। যার ফলে নিজেদের মধ্যে সহাবস্থানের সৃষ্টি হবে।
- **নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরি করা:** বিবদমান দুই দেশের মধ্যে যাতে যুদ্ধ লেগে না যায়, সেজন্য জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এই বাহিনী বিরোধপূর্ণ সীমান্তে অবস্থান নেয়, যাতে দুটি দেশের মধ্যে সংঘর্ষ হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে।

জাতিসংঘের অভিবাসন সংক্রান্ত বৈশ্বিক চুক্তি

এক নজরে অভিবাসী চুক্তি

- ✓ **আনুষ্ঠানিক নাম-** Global Compact for Safe, Orderly and Legal Migration.
- ✓ পরিচয় নিরাপদ, সুশৃঙ্খল ও বৈধ অভিবাসনের জন্য বৈশ্বিক চুক্তি। এটি অভিবাসনের সর্বোচ্চ আইন।
- ✓ **স্বাক্ষর-** ২০১৮ সালের ১৯ ডিসেম্বর তারিখে মরক্কোর মারাকেশে ।
- ✓ **গুরুত্ব-** অভিবাসীদের সুরক্ষা ও মানবাধিকার, বৈধভাবে অভিবাসীদের জন্য সুযোগ তৈরি এবং তাদের কাজের সুযোগের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।
- ✓ **স্বাক্ষর করে-** ১৬০টির বেশি দেশ।
- ✓ **স্বাক্ষর করেনি-** যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া ও ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ শক্তিশালী বহু দেশ।
- ✓ **চুক্তির লক্ষ্য-** ২৩টি

২০১৮ সালের অভিবাসী সম্মেলনে বলা হয়, বর্তমান বিশ্বে মোট অভিবাসী ২৫.৮০ কোটি যা মোট জনসংখ্যার ৩.৪%। এদের মধ্যে ২০০০ সালের পরে বেড়েছে ৪৯%।

এই সম্মেলনে আরও বলা হয় যে, "জলবায়ু পরিবর্তন ও অন্যান্য দুর্যোগে আগামী বিশ্বে অভিবাসীর ঢেউ উঠবে।"

চুক্তি সম্পর্কে জার্মান চ্যান্সেলর অ্যাঙ্গেলা মার্কেল ও জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্তেনিও গুতেরেস বলেন, "দুর্ভোগ ও বিশৃঙ্খলা দূর করতে GCM (Global Compact for Migration) একটি রোডম্যাপ।"

SDG (টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট)

এক নজরে SDG এর ১৭টি লক্ষ্য

০১ দারিদ্র্য বিমোচন (No Poverty)

০২ ক্ষুধামুক্তি (Zero Hunger)

০৩ সুস্বাস্থ্য (Good health and well being)

০৪ মানসম্মত শিক্ষা (Quality Education)

০৫ লিঙ্গ সমতা (Gender Equality)

০৬ বিশুদ্ধ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা (Clean Water and Sanitation)

০৭ সাশ্রয়ী ও দূষণমুক্ত জ্বালানি (Affordable and clean Energy)

০৮ শোভন কাজ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি (Decent work and Economic Growth)

০৯ শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো (Industry, Innovation & Infrastructure)

১০ অসমতা হ্রাস (Reduced Inequalities)

১১ টেকসই নগর ও জনপদ (Sustainable Cities and Communities)

১২ পরিমিত ভোগ ও উৎপাদন (Responsible Consumption and Production)

১৩ জলবায়ু কার্যক্রম (Climate action)

১৪ জলজ জীবন (Life Below Water)

১৫ স্থলজ জীবন (Life on Land)

১৬ শান্তি, ন্যায় বিচার ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান (Peace, Justice and strong institutions)

১৭ অভীষ্ট অর্জনে অংশীদারিত্ব (Partnership for all Goals)

LDC

ভূমিকা

উন্নয়নশীল বিশ্বে বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য ECOSOC ১৯৬৪ সালে UNCTAD গঠন করে। ১৯৬৪ সালেই UNCTAD আবার G-77 গ্রুপ গঠন করে যার সদস্যগুলো মূলত উন্নয়নশীল ৭৭টি দেশ। ১৯৭১ সালে জাতিসংঘ G-77 ভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে বাণিজ্যে পিছিয়ে পড়া দেশগুলোকে LDC তালিকাভুক্ত করে। স্বাধীনতার পর ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ LDC ভুক্ত হয়।

LDC থেকে উত্তরণের শর্ত:

সূচক/LDC থেকে মুক্ত হওয়ার শর্ত	CDP শর্ত	বাংলাদেশের অর্জন	
		২০১৮	২০২১
গড় মাথাপিছু আয় (GNI)	১২৩০ ডলারের বেশি (২০২১ সালে নতুন মানদণ্ড ১২২২ ডলারের বেশি)	১২৭৪ ডলার	১৮২৭ ডলার
মানব সম্পদ সূচক (HAI)	৬৬ বা তার বেশি	৭৫.২	৭৫.৩
অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচক (EVI)	৩২ বা তার কম	২৫.২	২৭.২

[তথ্যসূত্র : United Nationas: Department of Economic and Social Affairs]

চ্যালেঞ্জ সমূহ

নভেম্বর, ২০২৬ বাংলাদেশ LDC থেকে মুক্ত হয়ে উন্নয়নশীল দেশে পদার্পন করলে অনেকগুলো সুবিধা হারাবে এবং কিছু চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হবে —

- ✓ GSP সুবিধা, কোটা সুবিধা ও শুল্ক সুবিধা হারানোর ফলে বাংলাদেশ তার বার্ষিক রপ্তানি আয়ের ১৪% বা ৫.৭৩ বিলিয়ন ডলার হারাতে পারে।
- ✓ পোশাক খাতের বাজার একসেস (Access) হারানোর ফলে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। ধারণা করা হচ্ছে পোশাক রপ্তানি ৮-১০% কমে যাবে।
- ✓ LDC থেকে উত্তরণের ফলে বাংলাদেশ আর বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার অধীনে LDC নির্দিষ্ট বিশেষ সুবিধাগুলো বা ডিফারেনশিয়াল ট্রিটমেন্টের জন্য যোগ্য হবে না।
- ✓ ২০২৭ সাল থেকে বাংলাদেশে আর Soft Loan বা স্বল্প সুদের ঋণ পাওয়ার যোগ্য হবে না। ঋণের জন্য বাংলাদেশকে কমপক্ষে ২.২৬% সুদে ঋণ পরিশোধ করতে হবে।
- ✓ বাংলাদেশ Green Climate Fund এর মতো বিশেষ তহবিল হতে অর্থ পাবে না। ফলে জলবায়ুর পরিবর্তনের ক্রমবর্ধমান বিপদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের স্থিতিস্থাপকতা কমে যাবে। যেহেতু বাংলাদেশ জলবায়ু বিপর্যয়ের দ্বারা সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলির মধ্যে একটি হবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে, সুতরাং GCF হারানো একটি বড় ধাক্কা হতে পারে।

LDC

- ✓ জাতিসংঘের প্রযুক্তি ব্যাংক স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে টেকসই উন্নয়নের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি খাতে সহায়তা দিয়ে থাকে। উন্নয়নশীল দেশের ক্যাটাগরিতে চলে গেলে তারা বাংলাদেশকে আর সহায়তা করবে না।
- ✓ স্বল্পোন্নত দেশ হিসাবে জাতিসংঘে বাংলাদেশের চাঁদার পরিমাণ খুবই কম কিন্তু উন্নয়নশীল দেশের ক্যাটাগরিতে চলে গেলে বাংলাদেশের প্রদেয় চাঁদার পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে।

LDC থেকে উত্তরণের সুবিধা

LDC থেকে উত্তরণের ফলে বাংলাদেশ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার পাশাপাশি কিছু সুবিধাও পাবে—

- ➢ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে দেশের ভাবমূর্তি বৃদ্ধি পাবে। ফলস্বরুপ, দেশের ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ সম্পর্কে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা ইতিবাচক সংকেত পাবে এবং সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ (FDI) বৃদ্ধি পাবে।
- ➢ সুদের হার বাড়লেও উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে বৈদেশিক ঋণ পাওয়া সহজ হবে এবং ব্যবসায়ীদের LC (Letter of Credit) নিশ্চিতকরণের খরচ বিদেশি ব্যাংকগুলি কমিয়ে দেবে।
- ➢ বিনিয়োগ বৃদ্ধির কারণে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে। সরকারের ভ্যাট, ট্যাক্স এবং রাজস্ব আদায়ও বাড়বে।

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

- সিডো (CEDAW)-এর গুরুত্ব সংক্ষিপ্ত ভাবে উল্লেখ করুন। [৪০তম বিসিএস লিখিত]
- জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির পক্ষে যুক্তি গুলো কী? [৩৬তম বিসিএস লিখিত]
- জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ সম্পর্কে আলোচনা করুন। [৩৬তম বিসিএস লিখিত]
- জাতিসংঘ সনদ (UN Charter) অনুসারে নিরাপত্তা পরিষদের (Security Council) গঠন ও মূল দায়িত্ব কী? [৩৫তম বিসিএস লিখিত]
- সমসাময়িক বিশ্বের ভূ-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক শক্তির ভারসাম্যের প্রতিফলনে নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কারসমূহের দাবি আলোচনা করুন। [৩৫তম বিসিএস লিখিত]
- নিরাপত্তা পরিষদে অস্থায়ী সদস্য দেশের ভূমিকা লিখুন। [৩৪তম বিসিএস লিখিত]
- "জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনীতে বাংলাদেশ একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র।" –আলোচনা করুন। [৩৩তম বিসিএস লিখিত]
- 'জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের কোন কোন সদস্যরাষ্ট্রের ভেটো' প্রয়োগের ক্ষমতা রয়েছে? [৩২তম বিসিএস লিখিত]
- জাতিসংঘ শান্তি মিশনে বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীদের ভূমিকা ও অবদানের মূল্যায়ন করুন। [৩২তম বিসিএস লিখিত]
- জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যের সংখ্যা কত এবং বর্তমান (২০২১ সালে) কোন কোন দেশ এই পরিষদের অস্থায়ী সদস্য? [৩১তম বিসিএস লিখিত]

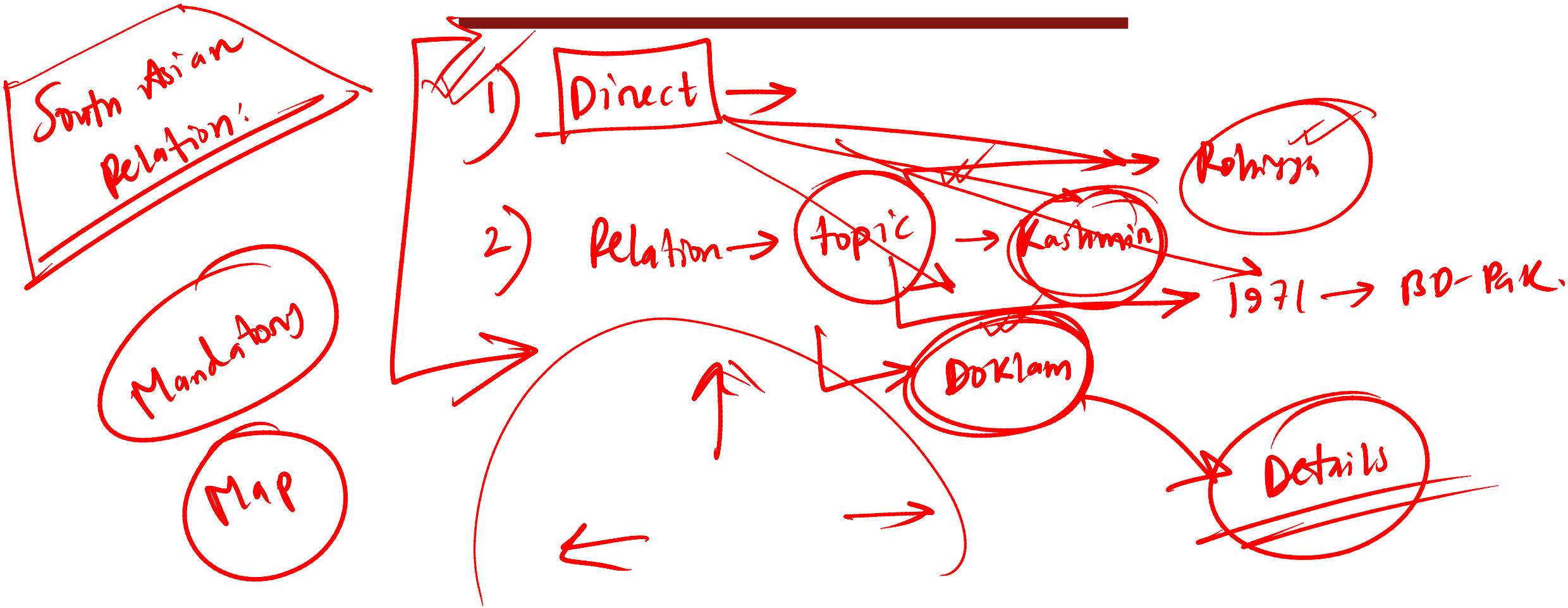
South Asian Relation:
1) Direct
Rohingya
2) Relation
topic
Kashmir
1971 → BD-Pak.
Mandatory
Map
Doklam
Details

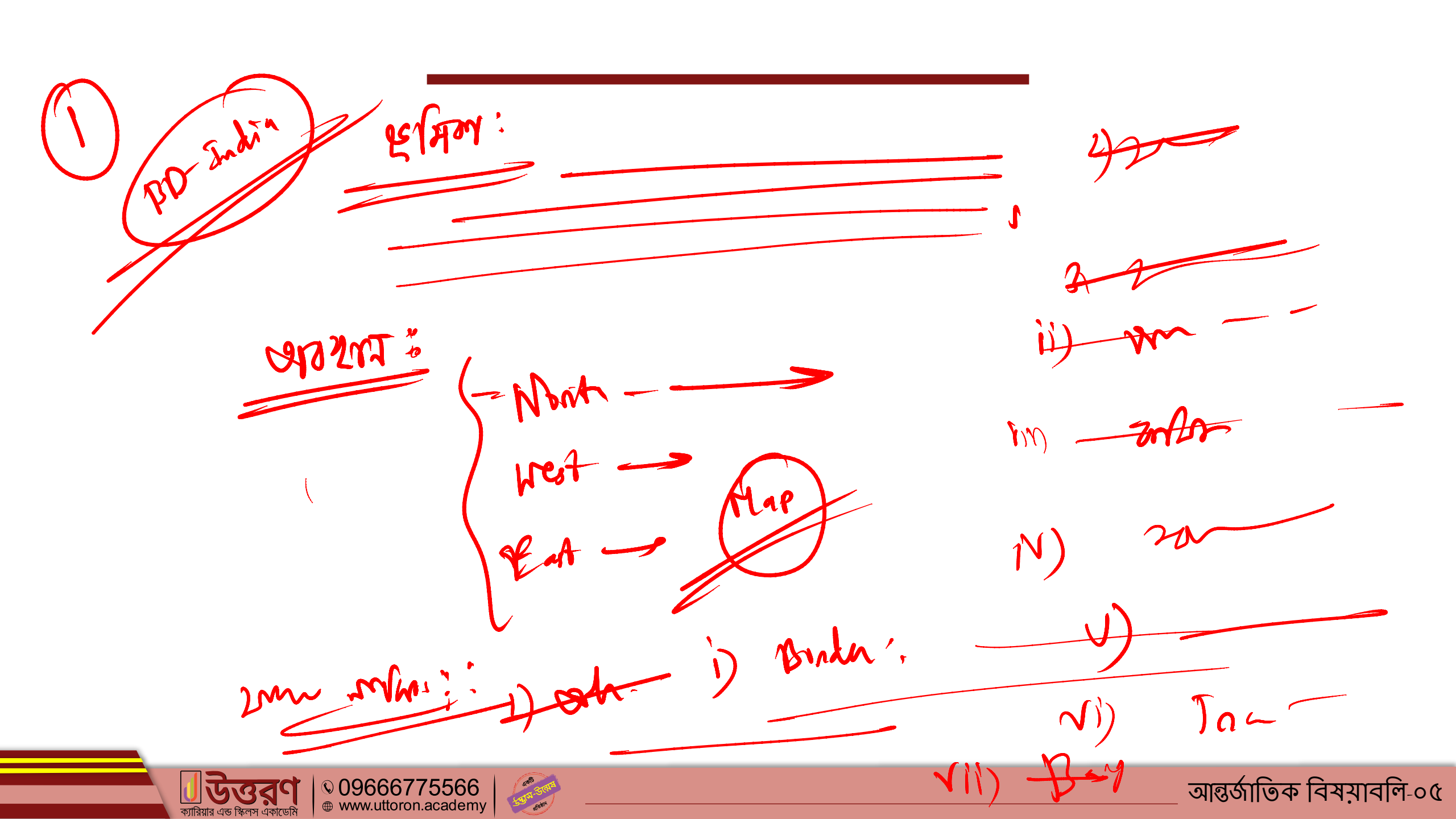

1

BD India

ভূমিকা :

অবস্থান :

- North
- West
- East

Map

সীমান্ত রাজ্য :

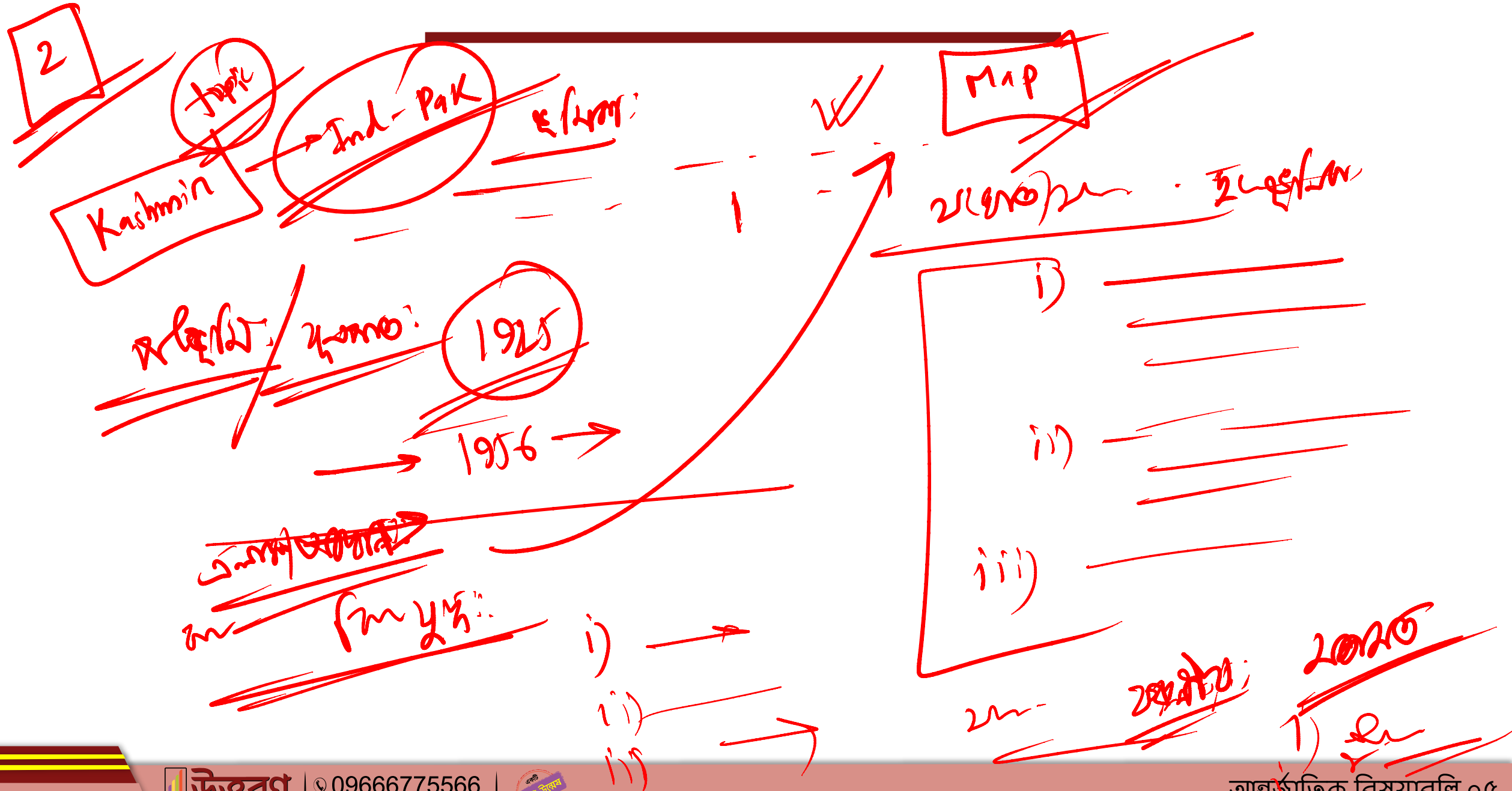

2

Topic

Kashmir

Ind-Pak

Map

1965

ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক (কাশ্মীর সংকট)

চিত্র: কাশ্মীরের মানচিত্র

pie-chart

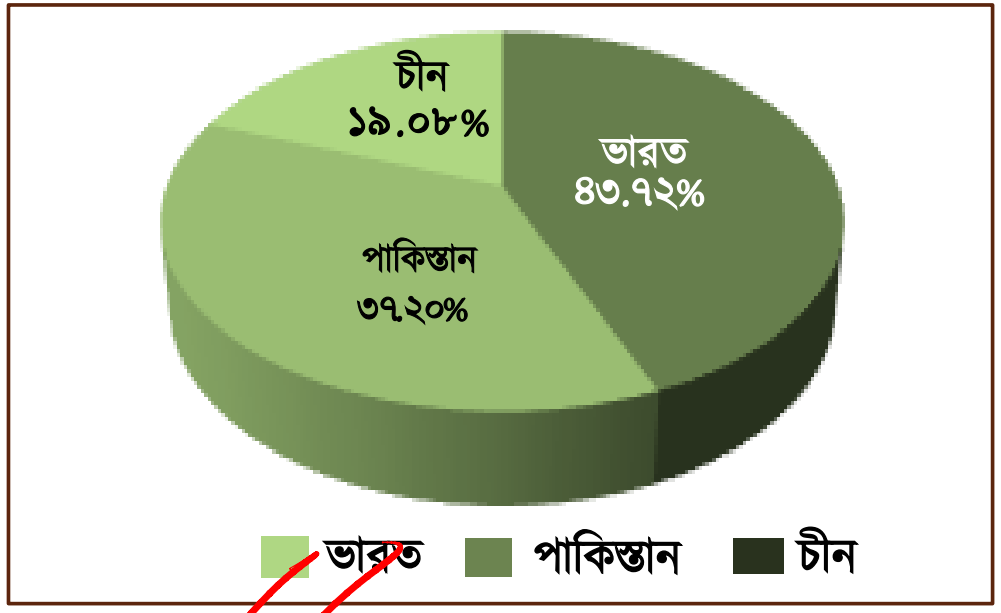

চিত্র: কাশ্মীরের দখলকৃত অংশ

ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক (কাশ্মীর সংকট)

রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের সূচনা

১৯২৫ সালে কাশ্মীরের রাজা নিযুক্ত হন হরি সিংহ এবং ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনিই ছিলেন কাশ্মীরের শাসক। "ইন্ডিয়ান ইনডিপেন্ডন্স অ্যাক্ট" এ বলা হয়েছিল, কাশ্মীর তার ইচ্ছে অনুযায়ী ভারত অথবা পাকিস্তানে যোগ দিতে পারবেন। আবার তারা যদি চান তবে স্বাধীন থেকেও নিজেদের শাসনকাজ পরিচালনা করতে পারবেন।

কাশ্মীরের তৎকালীন হিন্দু রাজা হরিসিংহ চাইছিলেন স্বাধীন থাকতে অথবা ভারতের সাথে যোগ দিতে। কিন্তু কাশ্মীরের ৮৫% জনগণ ছিল মুসলমান। জনগণের বিরাট একটি অংশ চেয়েছিলেন পাকিস্তানের সাথে যোগ দিতে।

১৯৪৭ সালের অক্টোবরে পাকিস্তানের পশতুন উপজাতিরা কাশ্মীর আক্রমণ করে। আক্রমণের মুখে হরিসিংহ ভারতের সহায়তা চান এবং ভারতে যোগ দেবার এক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। ১৯৪৭ সালে কাশ্মীর নিয়ে শুরু হয় প্রথম পাক-ভারত যুদ্ধ।

কাশ্মীরের সাম্প্রতিক সংকট

কাশ্মীরে বিদ্রোহী তৎপরতা বড় আকারে শুরু হয় ১৯৮৭ সালে বিতর্কিত স্থানীয় নির্বাচনের পরে জেকেএলএফ (JKLF) নামে সংগঠনের উত্থানের মধ্যে দিয়ে। এই রাজ্যে ১৯৮৯ সালের পর থেকে সহিংস বিদ্রোহ নানা উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে গেছে। ২০০৮ সালে মুম্বাই হামলা ছিল অত্যন্ত আলোচিত। ভারত বারবার অভিযোগ করেছে, পাকিস্তান সীমান্তের ওপার থেকে জঙ্গিদের পাঠাচ্ছে, যদিও পাকিস্তান তা বারবার অস্বীকার করে।

২০১৪ সালে হিন্দু জাতীয়তাবাদী নরেন্দ্র মোদীর সরকার ক্ষমতাসীন হবার পর পাকিস্তানের ব্যাপারে কঠোর নীতি নেবার ঘোষণা করে। পাশাপাশি শান্তি আলোচনার ব্যাপারেও আগ্রহ দেখায়।

পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফ দিল্লিতে মোদির শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানেও যোগদান করে। কিন্তু ২০১৫ সালে পাঞ্জাবের পাঠানকোটের ভারতীয় বিমান ঘাঁটিতে আক্রমণ হয়। যার জন্য পাকিস্তান ভিত্তিক জঙ্গিগোষ্ঠীগুলোকে দায়ী করে ভারত। মি. নরেন্দ্র মোদি তার ইসলামাবাদ সফরও বাতিল করে। ফলে দুই দেশের সম্পর্ক আবারও খারাপ হতে থাকে। ২০১৬ সালের জুলাই মাসে ২২ বছর বয়স্ক জঙ্গিনেতা বুরহান ওয়ানি ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর সাথে এক লড়াইয়ে নিহত হবার পর পুরো উপত্যকায় ব্যাপক বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে।

কাশ্মীরের সাম্প্রতিক সংকট

এক নজরে সাম্প্রতিক ঘটনা প্রবাহ:

- **জানুয়ারি ২০১৬:** পাঠানকোটে ভারতের বিমান ঘাঁটিতে হামলায় ৭ ভারতীয় সেনা ও ৬ জঙ্গি নিহত।
- **সেপ্টেম্বর ২০১৬:** ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের উরি সেনা ঘাঁটিতে হামলায় ১৯ জন সেনা নিহত। জবাবে পাকিস্তানের কাশ্মীরে ভারতের 'সার্জিক্যাল স্ট্রাইক' পরিচালনা।
- **১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯:** কাশ্মীরের পুলওয়ামায় জঙ্গি হামলায় ৪০ জনেরও বেশি আধা সামরিক পুলিশ সদস্য নিহত।
- **২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯:** পাকিস্তানের কাশ্মীরে জঙ্গি ঘাঁটিতে ভারতের বিমান হামলা। ভারতীয় সেনা পাকিস্তান কর্তৃক আটক ও পরে ভারতে ফেরত।
- **৫ আগস্ট, ২০১৯:** ভারতীয় সংবিধান হতে ৩৭০ ধারা বাতিল করার মাধ্যমে কাশ্মীরের বিশেষ সুবিধা বাতিল করে দেওয়া হয়। জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখ নামে ২টি কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করা হয়।

কাশ্মীরের বিশেষ সুবিধা বাতিল করে দেওয়ায় কাশ্মীরের জনগণ ও তাদের নেতা গুলাম নবী আজাদ, মেহবুবা মুফতি প্রমুখ তীব্র প্রতিবাদ জানায়। কাশ্মীরিদের কার্যত বন্দি করা হয় গোটা রাজ্যে। এ ঘটনায় পাকিস্তান তীব্র প্রতিবাদ জানায় এবং কাশ্মীরীদের সহযোগিতা করার ঘোষণা দেয়।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান কড়া বক্তব্য দেন, এমনকি পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের হুমকি প্রদান করেন।। ভারত এ বক্তব্যে ক্ষুব্ধ এবং উস্কানি দেওয়ার অভিযোগ আনে ইমরানের বিরুদ্ধে। ভারত ৩৭০ ধারা বাতিল ও কাশ্মীরের সমস্যাকে নিজেদের অভ্যন্তরীণ বিষয় বলে বিশ্ব সম্প্রদায়ের কাছে তুলে ধরেন।

কাশ্মীর নিয়ে পাক-ভারতের অবস্থান/ সংঘাতের কারণ

ভারতের অবস্থান ও যুক্তি

১৯৪৭ সাল থেকেই কাশ্মীরকে নিজেদের ভূখণ্ড বলে দাবি করে আসছে ভারত। এ ব্যাপারে তারা আন্তর্জাতিক সমর্থন আদায়েরও চেষ্টা করছে। ভারতের যুক্তি হলো--

- ১৯৪৭ সালে কাশ্মীরের রাজা হরি সিং চুক্তির মাধ্যমে কাশ্মীরকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করায় কাশ্মীর ভারতেরেই অবিচ্ছেদ অংশ।
- ১৯৪৭ সালের পর ভারতীয় কেন্দ্রীয় সরকারের তত্ত্বাবধানে কাশ্মীরে অনেকগুলো জাতীয় ও প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসব নির্বাচনে কাশ্মীরিরা অংশ গ্রহণ করে কাশ্মীর ভারতের অংশ বলেই মেনে নিয়েছে।
- ১৯৭২ সালের সিমলা চুক্তি অনুযায়ী পাক-ভারতের সকল দ্বিপাক্ষিক সমস্যা দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমেই সমাধান করতে হবে। সুতরাং কাশ্মীর প্রশ্নে আন্তর্জাতিকীকরণ করা যাবে না এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ও কোনো সিদ্ধান্ত দিতে পারবে না।
- কাশ্মীরের জঙ্গিগোষ্ঠাকে পাকিস্তান অর্থ ও অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করছে যা ভারতের জন্য হুমকি তৈরি করেছে।
- কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন বিস্তৃত হতে পারে। ফলে ভারতের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা, স্বাধীনতা ও অখণ্ডতা হুমকির

কাশ্মীর নিয়ে পাক-ভারতের অবস্থান/ সংঘাতের কারণ

পাকিস্তানের অবস্থান ও যুক্তি

কাশ্মীরের জনগণের সাথে পাকিস্তানের ধর্মীয়, মানসিক ও ভৌগোলিক অনেক মিল রয়েছে। পাকিস্তান চায় কাশ্মীর ভারত হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে হয় স্বাধীন থাকুক না হয় তাদের সাথে যোগ দিক। এ জন্য তারা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে নিম্নলিখিত যুক্তি তুলে ধরে,

- ✓ ১৯৪৭ সালে 'ইন্ডিয়ান ইনডিপেনডেন্স অ্যাক্ট' অনুযায়ী মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠ হওয়ায় কাশ্মীর হয় স্বাধীন হবে না হয় পাকিস্তানের অংশ হবে। কখনোই ভারতের অংশ হবে না।
- ✓ কাশ্মীরের মহারাজা হরিসিংহ এর একক সিদ্ধান্তে কাশ্মীরিদের ভাগ্য নির্ধারিত হবে না। প্রয়োজনে গণভোটের আয়োজন করে কাশ্মীরের জনগণের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।
- ✓ ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ বলেছিল কাশ্মীরে গণভোটের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে সেখানকার জনগণ। সুতরাং জাতিসংঘের প্রস্তাব অনুযায়ী সেখানে গণভোট হতে হবে।
- ✓ কাশ্মীরে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় সেখানকার জনগণের প্রতি পাকিস্তানের নৈতিক দায়িত্ব রয়েছে। এজন্য কাশ্মীর ইস্যুতে পাকিস্তান আন্তর্জাতিকীকরণের চেষ্টা করছে।
- ✓ ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘের কর্তৃক গণভোটের প্রস্তাব থাকায় কোনভাবেই কাশ্মীর ইস্যুকে দ্বিপাক্ষিক ইস্যু বলা যাবে না। এছাড়া বিষয়টি বহুবার জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে আলোচিত হয়েছে। সুতরাং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মধ্যস্থতার মাধ্যমেই বিষয়টির সমাধান করতে হবে।
- ✓ সিমলা চুক্তির দোহাই দিয়ে কাশ্মীর ইস্যুকে দ্বিপাক্ষিক বিষয় বলা যাবে না। কারণ সিমলা চুক্তিতে কাশ্মীরকে বাইরে রাখা হয়েছিল।

কাশ্মীর নিয়ে পাক-ভারতের অবস্থান/ সংঘাতের কারণ

৩৭০ ধারা বাতিল

৫ আগস্ট, ২০১৯ সালে রাজ্যসভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের নির্দেশনা পড়ে শোনান। তিনি জানান রাষ্ট্রপতির আদেশ বলে জম্মু কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বাতিল করা হয়েছে। প্রত্যাহার করা হয়েছে ৩৫(ক) ধারাও।

৩৭০ ধারা বাতিলের পক্ষে ভারতের যুক্তি:

৩৭০ ধারা বাতিলের পক্ষে ভারত মোটাদাগে নিম্নোক্ত যুক্তি তুলে ধরেছে –

- ✓ বিজেপি তাদের নির্বাচনি ইশতেহারে ৩৭০ ধারা বাতিল করতে চেয়েছিল। নির্বাচনে নিরঙ্কুশ জয়লাভ করায় এটা বাতিল করা তাদের নৈতিক দায়িত্ব।
- ✓ কাশ্মীরের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ৩৭০ ধারা প্রধান বাধা হয়ে বিরাজ করছিল।
- ✓ কাশ্মীরে জঙ্গি সন্ত্রাস দমনে এই সংবিধানের বিশেষ ধারা বাতিল অনিবার্য।
- ✓ ৩৭০ ধারা ছিল সাময়িক ও অস্থায়ী বিধান। তাই এটা পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে কোনো বাধা নেই।

কাশ্মীর নিয়ে পাক-ভারতের অবস্থান/ সংঘাতের কারণ

৩৭০ ধারা বাতিলের বিপক্ষে পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়া:

- ✓ পাকিস্তান ভারতীয় হাইকমিশনারকে বহিষ্কার করে এবং নয়াদিল্লিতে পাকিস্তানের দূতকে প্রত্যাহার করে।
- ✓ ভারতের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য বন্ধ ঘোষণা করে।
- ✓ পাকিস্তানে ভারতের সিনেমা প্রদর্শন বন্ধ করে দেয় ।
- ✓ পাকিস্তান দুই দেশের মধ্যে ট্রেন যোগাযোগ বন্ধ করে।
- ✓ ভারতীয় বিমানের জন্য পাকিস্তানের আকাশ পথ বন্ধ করে ।

৩৭০ ধারা বাতিলের প্রভাব:

- ✓ অনুচ্ছেদটি বাতিলের ফলে কাশ্মীর এখন ভারতের মূলধারার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। ফলে কাশ্মীর যে বিশেষ মর্যাদা ও সুবিধা ভোগ করতো তার সুযোগ হারায়।
- ✓ জম্মু-কাশ্মীর ভেঙে দুটি আলাদা কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল (কাশ্মীর ও লাদাখ) গঠন করা হয়।

কাশ্মীর নিয়ে পাক-ভারতের অবস্থান/ সংঘাতের কারণ

এই ধারা বাতিলের ফলে যেসব প্রভাব পড়তে পারে:

- ✓ জম্মু-কাশ্মীর ছাড়াও ভারতের আরও ৮টি রাজ্যে এই বিশেষ সুবিধা ভোগ করে থাকে। যেসব অঞ্চলে বিশেষ সুবিধা পেয়ে আসছে সেগুলোর মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়। নাগাল্যান্ড, মিজোরামে বিক্ষোভ হয়, দার্জিলিংয়ে পৃথক রাজ্য গঠনের দাবি ওঠে।
- ✓ এটি কাশ্মীরের জনতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নষ্ট করে দিবে। অন্য অঞ্চলের মানুষ এখন কাশ্মীরে গিয়ে বসবাস করবে, স্থানীয় মহিলাদের বিয়ে করে সংসার করবে। ৩৫(ক) ধারা বলে এগুলো করার সুযোগ আগে ছিল না। এর ফলে মুসলমান জনগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নষ্ট হবে, জন্ম হবে এক সংকর জাতির। হিন্দুরাও বসবাস করার সুযোগ পাবে ফলে মুসলমানরা সংখ্যালঘু হওয়ার ঝুঁকিতে থাকবে। এজন্যই সাবেক মুখ্যমন্ত্রী মেহবুবা মুফতি বলেছেন, ধারা (৩৭০) বিলোপের ফলে কাশ্মীরের সাথে ভারতের ভঙ্গুর সম্পর্ক পুরাপুরি নষ্ট করে দিবে।
- ✓ এই ধারা বাতিলের ফলে চীন ও ভারতের মধ্যকার সম্পর্কও খারাপ হবে। চীন মনে করে, ভারত এই আইন একতরফাভাবে সংশোধন করায় আঞ্চলিক সার্বভৌমত্ব ক্ষুন্ন হচ্ছে, যা চীনের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ চীনের কাছে লাদাখ এলাকাটি গুরুত্বপূর্ণ।
- ✓ এমনিতেই নানা ইস্যুতে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বৈরী সম্পর্ক বিদ্যমান। কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে এর আগেও ৩টি যুদ্ধ হয়েছে। আরও একটি যুদ্ধ তৈরির আশঙ্কা সৃষ্টি করেছে কাশ্মীরের এই পরিস্থিতি। দুই পক্ষই হুমকি পাল্টা হুমকি প্রদান করে। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ইমরান খান একে কেন্দ্র করে পারমাণবিক যুদ্ধের আশঙ্কা প্রকাশ করেন।

কাশ্মীর নিয়ে পাক-ভারতের অবস্থান/ সংঘাতের কারণ

- ✓ এই ইস্যুটি বাংলাদেশের জন্যও চিন্তার বিষয়। কারণ নির্বাচনের ইশতেহারের দোহাই দিয়ে BJP সরকার যদি এত বড় কাজ করতে পারে তবে সেই একই দোহাই দিয়ে আসামের নাগরিকপঞ্জি বা NRC হতে যে ১৯ লাখ লোকের নাম বাদ পড়েছে তাদের বাংলাদেশে পাঠাতে পারে। কারণ BJP মনে করে এরা বাংলাদেশের নাগরিক। যদিও ভারতীয় কর্তৃপক্ষ বলেছে এটি তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়। বাংলাদেশের এ ব্যাপারে চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই।
- ✓ এ ঘটনার ফলে কাশ্মীরে জঙ্গিবাদী তৎপরতা বৃদ্ধি পাবে। তরুণরা ব্যাপকভাবে জঙ্গিগোষ্ঠীগুলোতে যোগ দিবে। ইতোমধ্যে সেখানে বেশ কিছু জঙ্গিগোষ্ঠীর জন্ম হয়েছে। যেমন: জইশ-ই-মোহাম্মদ, হিজবুল মোজাহিদীন, ইসলামিক স্টেট খোরসান প্রভৃতি। উল্লেখ্য যে, ২০০১ সালে মার্কিন সৈন্যরা আফগানিস্তানে এ রকম আগ্রাসন চালানোর পর সেখানে জঙ্গি তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছিল।
- ✓ কাশ্মীরি গ্লোবালের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কাশ্মীরে গত তিন দশকে ৯৫ হাজার ২৩৮ জন কাশ্মীরিকে হত্যা করেছে ভারতীয় বাহিনী। জাতিসংঘের প্রতিবেদনেও ভারতীয় বাহিনীর নির্যাতন আর অত্যাচারের খবর রয়েছে। BBC এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে ২০১৬ সালে কাশ্মীরে প্রায় ৫০০ লোক নিহত হয়েছে। বহির্বিশ্বে ভারতের ভাবমূর্তির জন্য এটা কোনো ভালো খবর নয়। ভারত বড় শক্তি। ভারত জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হতে চায়। কিন্তু জম্মু-কাশ্মীর নিয়ে ভারতের সিদ্ধান্ত ও সিদ্ধান্ত পরবর্তী সেখানকার পরিস্থিতি ভারতের বিশ্ব শক্তি হয়ে উঠার পথে বড় অন্তরায় হয়ে দেখা দেবে।

কাশ্মীর নিয়ে পাক-ভারতের অবস্থান/ সংঘাতের কারণ

কাশ্মীর সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান

- ✓ একটি কার্যকরী পরিষদ গঠন করে, তার অধীন কাশ্মীরিদের একতাবদ্ধ করা। একটি শক্তিশালী প্রতিনিধি সৃষ্টি করা এবং বিশ্ব জনমত সৃষ্টির জন্য উদ্যোগ গ্রহণ ও কর্মসূচী হাতে নেওয়া যেতে পারে।
- ✓ অবাধ ও নিরপেক্ষ গণভোটের মাধ্যমে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে।
- ✓ কাশ্মীর সমস্যা সমাধানে উভয় দেশের সরকার যাতে বাধ্য হয়, সেজন্য প্রচলিত বৈধ পন্থায় আন্তর্জাতিক আইন মেনে বেসামরিক আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া।
- ✓ ভারত কর্তৃক কাশ্মীরকে যথেষ্ট স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা।
- ✓ স্থানীয় ও আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের পথ বের করার চেষ্টা করা।
- ✓ পাকিস্তান কর্তৃক জঙ্গিদের সহায়তা বন্ধ করে দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে সমাধান বের করার চেষ্টা করা।
- ✓ দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক শান্তি ও নিরাপত্তার স্বার্থে আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা। সার্ক ও বিমসটেকের মাধ্যমে তৎপরতা চালানো।
- ✓ জাতিসংঘকে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে হবে। জাতিসংঘকে কাগুজে বাঘ না হয়ে সত্যিকার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

চীন-ভারত দ্বন্দ্ব

পাক ভারত যুদ্ধে চীনের অবস্থান

১৯৬৫ এবং ১৯৯৯ সালে কাশ্মীর নিয়ে পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হলে চীন পাকিস্তানকে সহায়তা করে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ নিয়ে পাকিস্তানের সাথে ভারতের আরেকটি যুদ্ধ হয় (৩ ডিসেম্বর-১৬ ডিসেম্বর) যেখানে চীন পাকিস্তানকে সমর্থন করে।

তিব্বত নিয়ে চীন ও ভারতের দ্বন্দ্ব

১৯৫০ সালে চীন, ভারত-চীনের মধ্যবর্তী রাষ্ট্র তিব্বত দখল করে নেয়। এসময় তিব্বতের বৌদ্ধ ধর্মগুরু এবং বিপ্লবী নেতা "দালাইলামা" ভারতে আশ্রয় নেয়। দালাইলামাকে নিয়ে চীন-ভারত সম্পর্কের চরম অবনতি হয়। দালাইলামা ভারতে নির্বাসিত তিব্বত সরকার গঠন করেন ১৯৫৯ সালে এবং ১৯৬৯ সালে চীনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। এ দালাইলামা চীন-ভারত সম্পর্কের অন্যতম নিয়ন্ত্রক।

চীন-ভারত দ্বন্দ্ব

কাশ্মীর নিয়ে চীন-ভারত দ্বন্দ্ব

১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে পাকিস্তান আর ভারত স্বাধীনতা পাবার আগে থেকেই কাশ্মীর নিয়ে বিতর্কের সূচনা হয়। ১৯৪৮ থেকেই কাশ্মীর কার্যত পাকিস্তান ও ভারত নিয়ন্ত্রিত দুই অংশে ভাগ হয়ে যায়। অন্যদিকে ১৯৬২ সালের চীন-ভারত যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে চীন কাশ্মীরের আকসাই-চীন অংশটির নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে, আর তার পরের বছর পাকিস্তান-কাশ্মীরের ট্রান্স-কারাকোরাম অঞ্চলটি চীনের হাতে ছেড়ে দেয়। সেই থেকে কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণ পাকিস্তান, ভারত ও চীন এই তিন দেশের মধ্যে ভাগ হয়ে আছে।

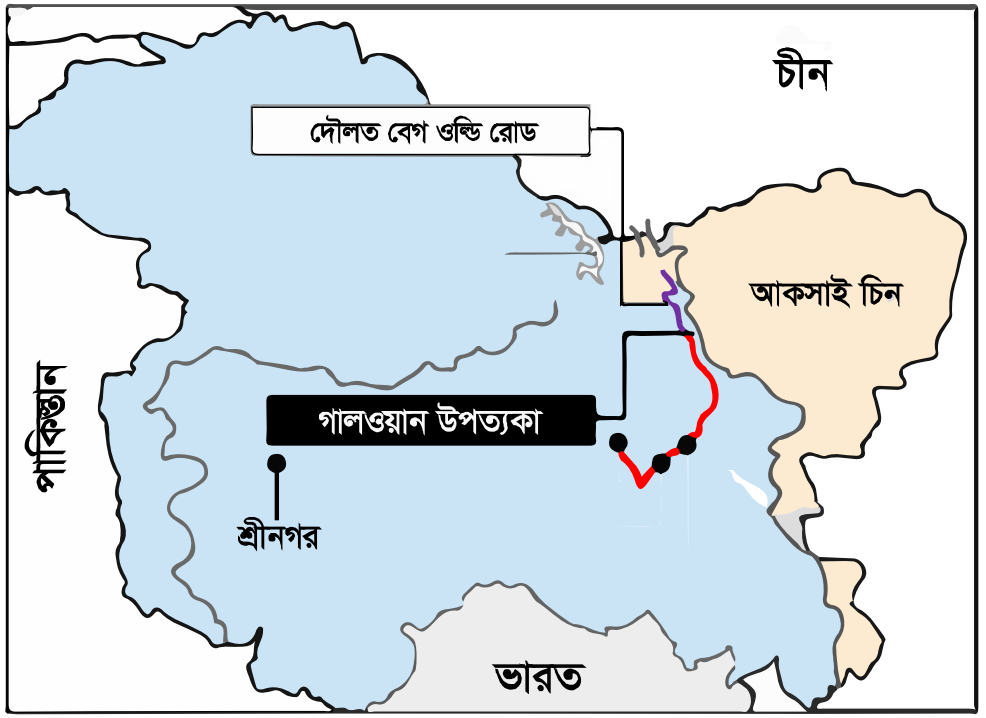

চিত্র: ভারত-চীন সীমান্ত সংঘাত (গালওয়ান উপত্যকা)

সম্প্রতি ২০২০ সালের ১৫ জুন গালওয়ান উপত্যকায় চীন ভারত সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। ঐতিহাসিকভাবেই হিমালয় অঞ্চলভুক্ত ১৪৭০০ বর্গমাইল আয়তনের গালওয়ান উপত্যকায় চিহ্নিত কোনো সীমান্ত নেই। চীন ও ভারত উভয়ই এ অঞ্চলটি তাদের বলে দাবি করে। গালওয়ান উপত্যকা অত্যন্ত দুর্গম একটি অঞ্চল, তাপমাত্রা থাকে মাইনাস ৫৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মতো। সেখানে কোনো জনবসতি নেই এবং সেখানে বসবাস করাও একরকম অসম্ভব।

তবে এর একটি স্ট্র্যাটেজিক গুরুত্ব রয়েছে, এই কারণেই গালওয়ানকে ঘিরে চীন-ভারত দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়। গালওয়ান উপত্যকার সীমানা চিহ্নিতকরণ সংক্রান্ত 'লাইন অফ কন্ট্রোলের' পাশাপাশি ভারত ২৫৫ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি সড়ক নির্মাণ শেষ করেছে। এ সড়কটি লাদাখের রাজধানী লেহ-এর সঙ্গে চীনা সীমান্তের কাছাকাছি দৌলতবেগ আলভি সামরিক বিমানঘাঁটিকে সংযুক্ত করেছে। আগে লেহ থেকে দৌলতবেগ আলভি সামরিক বিমানঘাঁটিতে পৌঁছাতে দু'দিন লাগত। এখন লাগে মাত্র ৬ ঘণ্টা। গালওয়ান উপত্যকায় ভারতের এই সকল কর্মকাণ্ডকে চীন তার নিরাপত্তার প্রতি হুমকিস্বরূপ বলে মনে করে।

চীন-ভারত দ্বন্দ্ব

ডোকলাম সংকট

২০১৭ সালের জুন থেকে চীন ও ভারতের মধ্যে সীমান্ত নিয়ে উত্তেজনা চলছে। দেশ দুটির মধ্যে বিরোধের সূত্রপাত হয় ডোকলাম অঞ্চলে চীন একটি সড়ক নির্মাণের কাজ শুরু করার পর। এই মালভূমি অঞ্চলটি ভুটান ও চীন দুই দেশই তাদের বলে দাবি করে। এই অঞ্চলটি চীন, ভুটান ও ভারতের সিকিম প্রদেশের সংযোগস্থলের মালভূমি এলাকা। দাবির ক্ষেত্রে ভারত ভুটানের পক্ষে। ভারত মনে করে চীন যদি এ রাস্তাটি তৈরি করে তাহলে কৌশলগতভাবে ভারত পিছিয়ে পড়বে। চীন এমন জায়গায় সড়ক নির্মাণ করতে চাইছে যার পাশেই ভারতের ২০ কিলোমিটার চওড়া একটি করিডোর আছে। এ করিডোরের মাধ্যমে ভারতের উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলো মূল ভারতের সাথে সংযোগ রক্ষা করে। চীন বিষয়টি অনুধাবন করতে পারে বলেই সেখানে তাদের কৌশলগত অবস্থান জোরদারের চেষ্টা চালাচ্ছিল। আর দ্বন্দ্ব মূলত এ কারণেই।

লাদাখ নিয়ে চীন-ভারত দ্বন্দ্ব

ভূ-রাজনৈতিক কারণে লাদাখের অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৬২ সালে চীন এই অঞ্চলের আকসাই চীন দখল করে নেয়। ভারত এটিকে নিজেদের অংশ বলে দাবি করে আসছে। ২০২০ সালের জুন মাসে এই অঞ্চলকে কেন্দ্র করে ভারত-চীন দ্বন্দ্ব চরমে পৌঁছে। সংঘাতে ভারতের প্রায় ২০ জন সেনা নিহত হন। বর্তমানে লাদাখে ৬টি বিরোধ পূর্ণ 'হটস্পট' রয়েছে। সীমান্তের দুই পাশে চীন ও ভারত দুই দেশই সেনা মোতায়েন করে রেখেছে। বিশ্লেষকদের মতে, ভবিষ্যতে লাদাখ নিয়ে দেশ দুটির সংঘাত আরো দীর্ঘায়িত হবে।

চীন-ভারত দ্বন্দ্ব

BRI প্রকল্প নিয়ে বিরোধ

চীনের Belt and Road Initiative প্রকল্পে একসময় ভারত আগ্রহ দেখালেও বর্তমানে ভারত তাদের মনোভাব ফিরিয়ে নিয়েছে। কারণ এ অঞ্চলে ভারত চীনকে তার প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে। এই প্রকল্পের বিকল্প হিসেবে ভারত 'কটন রুট' তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ফলে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দেশ দুটি ক্রমান্বয়ে বিরোধে জড়িয়ে পড়ছে।

ইন্দো-প্যাসিফিক স্ট্রাটেজি ইস্যু

চীনকে পরাশক্তি হতে দমিয়ে রাখার নীতি হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র IPS ঘোষণা করেছে। এই IPS এর প্রধান অংশীদার ভারত, জাপান, অস্ট্রেলিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্র। যেহেতু ভারত IPS এর প্রধান অংশীদার তাই এই ইস্যুকে কেন্দ্র করে চীন-ভারত সম্পর্কে তিক্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

QUAD ইস্যু

Quadrilateral Security Dialogue (QUAD) হলো যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, জাপান ও অস্ট্রেলিয়ার সমন্বয়ে গঠিত একটি সামরিক জোট। একে এশিয়ার NATO বলা হচ্ছে। এর মূল উদ্দেশ্য চীনের অর্থনৈতিক ও সামরিক অগ্রযাত্রা প্রতিহত করা। যেহেতু ভারত এ জোটের প্রধান অংশীদার তাই এ ইস্যুকে কেন্দ্র করে চীন-ভারত তিক্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বাংলাদেশ ভারত সম্পর্ক

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অবদান

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের পাশে সবচেয়ে বড় বন্ধু হয়ে দাঁড়িয়েছিল, ভারত এবং ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। ভারতই প্রথম রাষ্ট্র যারা ২৬শে মার্চ বাঙালিদের উপর পাকিস্তানিদের চালানো বর্বর গণহত্যার প্রতিক্রিয়া জানায় ও সারা দুনিয়ায় এই গণহত্যার সংবাদ প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ২৭শে মার্চই ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশের পক্ষে প্রথম পূর্ণ সমর্থন দান করেন।

উন্নত ভারী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত পাক হানাদার বাহিনী যখন নিরস্ত্র বাঙালিদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তখন প্রাণ বাঁচাতে লক্ষ লক্ষ মানুষ শরণার্থী হিসেবে ভারতে আশ্রয় নিতে শুরু করে। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, আসাম, মেঘালয় ও ত্রিপুরার সীমান্তবর্তী অঞ্চলে স্থাপিত শরণার্থী শিবিরগুলোতে যুদ্ধের নয় মাসে প্রায় ১ কোটি মানুষকে আশ্রয়, খাদ্য ও নিরাপত্তা দিয়েছিল ভারত সরকার। এই বিপুল সংখ্যক মানুষকে তাৎক্ষণিকভাবে আশ্রয় দিয়ে প্রাণে বাঁচতে সাহায্য করায় ভারতের অবদান বাংলাদেশের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। মুক্তিবাহিনী গঠনের পর ভারতের আগরতলা ও ত্রিপুরায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাছ থেকে তারা প্রশিক্ষণ পায়। বাংলাদেশি মুক্তিবাহিনী ও গেরিলাযোদ্ধাদের অস্ত্র দিয়েও সাহায্য করে ভারতীয় সরকার। এই প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র সাহায্য ছাড়া বাংলাদেশের পক্ষে মুক্তিযুদ্ধ করা সম্ভব হতো না।

বাংলাদেশ ভারত সম্পর্ক

শুধু মুক্তিবাহিনীদের সাহায্য করাই না, কোণঠাসা পাকিস্তান সরকার নিরুপায় হয়ে ৩ ডিসেম্বর ভারতের বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করলে ভারত সরাসরি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। ফলে যুদ্ধে পাকিস্তানের পরাজয় আরও ত্বরান্বিত হয়। বাংলাদেশি মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় সেনাবাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত যৌথ বাহিনীর কাছেই ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনী আত্মসমর্পণ করে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের প্রায় ৩৯০০ জন সেনা নিহত হয় [সূত্র: মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়] যাদের ২০১৮-১৯ অর্থবছর থেকে ভাতা দেওয়া হচ্ছে।

রণাঙ্গনে যুদ্ধের পাশাপাশি ভারত সরকার মুক্তিযুদ্ধে প্রাশাসনিক ও কূটনৈতিকভাবেও বাংলাদেশকে সাহায্য করে। মেহেরপুরের মুজিবনগরে বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার শপথগ্রহণ করলেও এর কার্যালয় স্থাপিত হয় কলকাতার ৮নং থিয়েটার রোডে। সেখান থেকেই প্রবাসী সরকার মুক্তিযুদ্ধে নির্দেশনা প্রদান ও বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের পক্ষে অবাধে প্রচারণা চালানোর সুযোগ পায়। এছাড়াও চট্টগ্রামের কালুরঘাটে স্থাপিত স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রথম কার্যালয় ১৯৭১ সালের ২৮মার্চ পাকিস্তানিদের বিমান হামলায় ধ্বংস হয়ে গেলে পরবর্তীতে তা কলকাতার ৫৭/৮ নং রোডের বাড়িতে স্থাপন করা হয় এবং সেখান থেকেই ২৫ মে আবার সম্প্রচার শুরু করে অস্থায়ী বেতারকেন্দ্রটি। বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের প্রথম দূতাবাসটিও কলকাতায় ১৯৭১ সালের ১৮ এপ্রিল স্থাপনের অনুমতি দেয় ভারত।

বাংলাদেশ ভারত সম্পর্ক

বাংলাদেশের পক্ষে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে জনমত গঠনেও ভারত ব্যাপক কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চালায়। এরমধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো ১৯৭১ সালের আগস্টে মস্কোতে রাশিয়ার সাথে ইন্দিরা গান্ধীর করা মৈত্রী চুক্তি। এই চুক্তির ফলেই রাশিয়া জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে যুক্তরাষ্ট্রের আনীত যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব ৩ বার ভেটো দিয়ে বাতিল করে দেয়। এছাড়াও তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন সরকার ভারতের মাধ্যমে বাংলাদেশি শরণার্থীদের জন্য ত্রাণ ও মুক্তিবাহিনীর জন্য অস্ত্র সাহায্য পাঠায়।

যুদ্ধকালীন সময়ে ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশের স্বাধীনতায় বিরোধিতাকারী যুক্তরাষ্ট্রেও সফর করেন এবং তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সনের সাথে সাক্ষাৎ করে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ব্যাপারে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। এছাড়াও যুক্তরাজ্য, ফ্রান্সের মতো শক্তিশালী পশ্চিমা দেশগুলোতে ভ্রমণ করে তিনি তাদের বাংলাদেশের পক্ষে আনতে সমর্থ হন। পরবর্তীতে বিশ্বনেতাদের চাপেই পাকিস্তান বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়।

মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের বিজয়ের পর বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি প্রথম লন্ডন যান, সেখান থেকে ১০ জানুয়ারি নয়াদিল্লী পৌঁছান। পালাম বিমান বন্দরে তাঁকে স্বাগত জানাতে ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ভি ভি গিরি, ইন্দিরা গান্ধী ও অন্যান্য মন্ত্রিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশের মাটিতে সেই সময় অবস্থানকারী ভারতীয় সৈন্যদের দ্রুত অপসারণের ব্যাপারে ইন্দিরা গান্ধী প্রতিশ্রুতি দেন যা ১৯৭২ সালের ১২ মার্চেই বাস্তবায়িত হয়। মাত্র ৩ মাসে এভাবে সৈন্য অপসারণের উদাহরণ ইতিহাসে অপ্রতুল।

বাংলাদেশ ভারত সম্পর্ক

পাকিস্তানে আটকা পরা প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ বাঙালিকে উদ্ধারের জন্য ১৯৭২ সালে ভারতের পক্ষ থেকে ইন্দিরা গান্ধী পাকিস্তানের জুলফিকার আলী ভুট্টোর সাথে সিমলা চুক্তি নামক একটি ঐতিহাসিক চুক্তি করেন। এই চুক্তি অনুসারে বাংলাদেশে আটকে পরা পাকিস্তানি সৈন্যদের মুক্তির বিনিময়ে বাংলাদেশ পাকিস্তানে অবস্থানরত বাঙালিদের মুক্তি, পাকিস্তান কর্তৃক নিঃশর্তভাবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান ও জাতিসংঘে সদস্যপদ পাবার ক্ষেত্রে পাকিস্তানের অনাপত্তি দাবি করা হয়। শর্তানুসারে পাকিস্তান চুক্তি স্বাক্ষরের আগেই আড়াই লাখ বাংলাদেশিকে মুক্তি দেয়। বাকি ২টি শর্তও ১৯৭৪ সালে বাস্তবায়িত হয়।

যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠনে ভারত সরকার এগিয়ে এসেছিল। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সংবিধান রচনাতেও ভারতের সংবিধানকে আদর্শ হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন সংবিধান রচয়িতারা। মূলত গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে মৌলিক আদর্শ মেনে ভারত ও বাংলাদেশ উভয় রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছিল বলে আদর্শিকভাবেই ভারতের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্কটি ঐতিহাসিকভাবেই অত্যন্ত গভীর ও অবিচ্ছেদ্য। বাংলাদেশের জন্মযুদ্ধ থেকেই ভারত আমাদের পাশে বন্ধু হিসেবে পাশে ছিল বলে বাংলাদেশের স্বার্থ সংরক্ষণে ভারতের কাছে প্রত্যাশা অনেক বেশি।

বাংলাদেশ ভারত সম্পর্ক

ভারতের সাথে বাণিজ্য

বাংলাদেশের তিন দিকেই ঘিরে আছে যে দেশ তা হলো ভারত। তাই সঙ্গত কারণেই ভারতের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্যের সম্পর্কটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পণ্যের সংখ্যা বিচারে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি পণ্য আমদানি করে ভারত থেকেই যা বাংলাদেশের মোট আমদানির শতকরা ১৫ ভাগ। বাংলাদেশও ভারতের কাছে রপ্তানির জন্য গুরুত্বপূর্ণ কারণ পশ্চিমা দেশের বাইরে বাংলাদেশেই ভারত সবচেয়ে বেশি রপ্তানি করে থাকে। অর্থাৎ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় পণ্য আমদানির জন্য বাংলাদেশ যেমন ভারতের উপর বিপুল পরিমাণে নির্ভর করে তেমনি বাংলাদেশও ভারতের কাছে রপ্তানির ক্ষেত্রে একটি বিশাল বাজার। কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাপকভাবে বৈষম্যের শিকার হয় ভারতে পণ্য রপ্তানি করার ক্ষেত্রে। ভারত থেকে আমদানির তুলনায় ভারতে বাংলাদেশের রপ্তানির পরিমাণ খুবই কম। ভারত বাংলাদেশ থেকে যে পণ্য আমদানি করে তার পরিমাণ ভারতের মোট আমদানির অতি ক্ষুদ্র, প্রায় এক অংশ। এই বাণিজ্যিক ভারসাম্যহীনতা ভারতের সাথে বাংলাদেশের বিশাল বাণিজ্য ঘাটতি তৈরি করেছে যা দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নের অন্যতম প্রধান অন্তরায়।

বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে পণ্য আমদানি-রপ্তানি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ২০০৫-২০০৬ অর্থ বছরে ভারত থেকে পণ্য আমদানি হয়েছিল ১৮৪ কোটি ৮৭ লাখ ডলারের। এর বিপরীতে বাংলাদেশ রপ্তানি করেছিল মাত্র ২৪ কোটি ২১ লাখ ডলারের পণ্য। অর্থাৎ সেই অর্থবছরে ভারতের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতি ছিল ১৬০ কোটি ৬৫ লাখ ডলার। ১০ বছরের ব্যবধানে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এ ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৫৯৭ কোটি ৩০ লাখ ডলারে। সর্বশেষ ২০২০-২১ অর্থ বছরে বাংলাদেশ ভারত থেকে আমদানি করে ৭৯১ কোটি ডলারের পণ্য এবং বাংলাদেশ ভারতে রপ্তানি করে ১২৮ কোটি ডলারের। সুতরাং বাণিজ্য ঘাটতি ৬৬৩ কোটি ডলারের। আশঙ্কার কথা হলো প্রতিবছর এ বাণিজ্য ঘাটতি উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে।

বাংলাদেশ ভারত সম্পর্ক

সর্বশেষ ৪ বছরে ভারতের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্যের চিত্র

অর্থবছর	বাংলাদেশের আমদানি	বাংলাদেশের রপ্তানি	বাণিজ্য ঘাটতি
২০১৮-১৯	৬৯৩ কোটি ডলার	১০৭ কোটি ডলার	৫৮৬ কোটি ডলার
২০১৯-২০	৫৭৯.৩ কোটি ডলার	১০৯.৬ কোটি ডলার	৪৬৯.৭ কোটি ডলার
২০২০-২১	৮৮৯ কোটি ডলার	১২৮ কোটি ডলার	৭৬১ কোটি ডলার
২০২১-২২	১৬১৯ কোটি ডলার	১৯৯ কোটি ডলার	১৪২০ কোটি ডলার

[সূত্র: অর্থনৈতিক সমীক্ষা ও EPB]

ভারতের সাথে বাংলাদেশের এরকম বিশাল বাণিজ্য ঘাটতি থাকলেও ভারত সরকার এ ঘাটতি হ্রাস করার লক্ষ্যে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। ভারতের বাজারে প্রবেশের লক্ষ্যে বাংলাদেশি পণ্যের শুল্ক হ্রাস করার জন্য বাংলাদেশ বারবার অনুরোধ জানালেও তারা এ বিষয়ে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। SAPTA চুক্তির অধীনে বেশ কয়টি পণ্যের শুল্ক হ্রাসের কথা বলা হলেও ভারত তা কার্যকর করেনি। সবচেয়ে দুঃখজনক হলো, ভারত বাংলাদেশি পণ্যের উপর শুল্ক ছাড় তো দেয়ইনি, বরং বাংলাদেশি পণ্যের উপর বিভিন্ন ট্যারিফ ও প্যারা-ট্যারিফ বসানোর ফলে ভারতের বাজারে বাংলাদেশের পণ্যের প্রবেশ প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

বৈধ আমদানি-রপ্তানিতে বৈষম্যের পাশাপাশি আরেকটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশ ভারত সীমান্তে সংঘটিত অবৈধ বাণিজ্য যার মোট পরিমাণ বৈধ বাণিজ্যের প্রায় সমান। এই অবৈধ বাণিজ্য বা চোরাচালানের ক্ষেত্রেও ভারত থেকে অনেক বেশি পণ্য বাংলাদেশে ঢুকছে। বাংলাদেশের পণ্য অবৈধ পথেও ভারতে তুলনামূলক কম ঢুকছে। এধরনের চোরাচালানের ফলে বাংলাদেশ যেমন বঞ্চিত হচ্ছে বিপুল পরিমাণ শুল্কের জন্য তেমন বাংলাদেশের উৎপাদক ও ব্যবসায়ীরাও হচ্ছেন ক্ষতিগ্রস্ত।

নদীর পানি বণ্টন বিষয়ক সমস্যা

নদীর পানি বণ্টন বিষয়ক চুক্তি ও সমঝোতা সমূহ

- ✓ **১৯৭২:** ভারত বাংলাদেশের অভিন্ন নদী সমূহের পানি প্রবাহ উভয় রাষ্ট্রের কল্যাণে ব্যবহারের লক্ষ্যে ১৯৭২ সালের ২৪ নভেম্বর স্বাক্ষরিত ৯ টি ধারা সংবলিত ভারত-বাংলাদেশ পানি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
- ✓ **১৯৭৭:** জাতিসংঘের হস্তক্ষেপে ১৯৭৭ সালের ৫ নভেম্বর ভারত ও বাংলাদেশ ৫ বছরের জন্য শুষ্ক মৌসুমে গঙ্গার পানি ভাগ করে নেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে চুক্তি করে।
- ✓ **১৯৮৩:** তিস্তার পানি বণ্টন বিষয়ক ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ১৯৮৩ সালে একটি সমঝোতা হয়। এই সমঝোতা অনুযায়ী তিস্তার পানির ৩৯ শতাংশ ভারত ও ৩৬ শতাংশ বাংলাদেশ পাওয়ার কথা থাকলেও প্রকৃতপক্ষে ভারত ৭৫ শতাংশের বেশি পানি নিয়ে নিচ্ছে।

বাংলাদেশ ভারত সম্পর্ক

- ✓ **১৯৮৫:** গঙ্গার পানি বিষয়ক আরও ৩টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ১৯৮৫ সালের নভেম্বরে। কিন্তু চুক্তিগুলো কার্যকর করতে বাংলাদেশের ব্যর্থতার কারণে মাত্র চার বছরের মাথায় ভারত গঙ্গা থেকে বিপুল পরিমাণ পানি প্রত্যাহার করায় বাংলাদেশের নদীগুলোতে পানিপ্রবাহ অনেকটাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
- ✓ **১৯৯৬:** গঙ্গার পানি ভাগাভাগি করা নিয়ে ১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর ভারত ও বাংলাদেশ ৩০ বছর মেয়াদি একটি চুক্তি করে। ১২টি অনুচ্ছেদে বিভক্ত এই চুক্তিতে গঙ্গার পানি বছরের কোন সময় কে কত কিউসেক পাবে, সেটা কীভাবে নির্ধারিত হবে, কারা করবে, তাদের নিয়োগ প্রক্রিয়া- এসব ব্যাপারে বিস্তারিত উল্লেখ ছিল। এই চুক্তির মেয়াদ শেষ হবে ২০২৬ সালে।
- ✓ **২০১১:** তিস্তার পানি নিয়ে একটি ১৫ বছরের চুক্তির জন্য খসড়া প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল ২০১১ সালে। ৪৬০ কিউসেক পানি প্রবাহ ধরে বাংলাদেশের দাবি ছিল ৫২% পানি ভারত নিয়ে বাংলাদেশকে ৪২% পানি দিবে। বাকি পানি প্রবাহের জন্য সঞ্চিত থাকবে। কিন্তু ভারত ৭৫% পানিই নিজেদের জন্য চাওয়ায় দুইদেশ আর একমত না হতে পারায় খসড়া চুক্তিটি আর আলোর মুখ দেখেনি।

ভারতের সাথে নদীর পানি সমস্যার প্রভাব

ফারাক্কা ও তিস্তা বাঁধের মাধ্যমে শুষ্ক মৌসুমে ভারত গঙ্গা ও তিস্তা নদীর পানি প্রত্যাহার করে নেওয়ায় বাংলাদেশের নদীগুলোতে পানি প্রবাহ, কৃষি, মৎস্য আহরণ, নৌপথ, জলবায়ুসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানাবিধ সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। এগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো-

- **নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ ব্যহত:** ফারাক্কা বাঁধের জন্য গঙ্গার প্রবাহিত পানি কমে আসায় পদ্মার নিচে যেমন পলি জমে বর্ষা মৌসুমে বন্যা সৃষ্টি করছে, তেমনি তিস্তা বাঁধের কারণে তিস্তা নদীর তলদেশে পাথর, নুড়ি ও বালু জমায় নদীর গতিপথ পরিবর্তন হয়ে নদীর দুই তীরে ভাঙ্গনের কবলে পড়ে প্রতি বছর গৃহহীন হচ্ছে প্রায় ২০ হাজার মানুষ। পর্যাপ্ত পানি প্রবাহের অভাবে গঙ্গার প্রধান শাখা নদী গড়াই এর মুখ পলি পড়ে ভরাট হয়ে যায়। ফলে পুরো মৌসুম জুড়েই এটি সরু খালে পরিণত হয়ে থাকে। অপরদিকে তিস্তার স্বাভাবিক প্রবাহ বজায় রাখতে যেখানে ৪০০০ কিউসেক পানি প্রবাহ দরকার সেখানে শুষ্ক মৌসুমে পানি প্রবাহ ৭০০ কিউসেকে নেমে আসে। এর কারণে নদীটির অস্তিত্বই হুমকির মুখে পড়ছে।

বাংলাদেশ ভারত সম্পর্ক

- **কৃষিক্ষেত্রে সমস্যা:** বাঁধ নির্মাণ করে ভারত গঙ্গা ও তিস্তা নদীর পানি অপসারণ করায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের কৃষিক্ষেত্র। গঙ্গা-কপোতাক্ষ নামক যে বৃহৎ সেচ প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছিল তা নদীর পানি প্রবাহ কমে যাওয়ায় অচল হয়ে যাচ্ছে বা সক্ষমতার চেয়ে অনেক কম মাত্রায় চলছে। প্রায় ১ লক্ষ বারো হাজার হেক্টর জমির সেচ কাজ হুমকির মুখে পড়েছে। এছাড়া পলি প্রবাহ ২০% কমে যাওয়ায় জমি হারাচ্ছে স্বাভাবিক উর্বরতা। তিস্তা বাঁধের কারণে দেশের উত্তরাঞ্চলের জন্য দেড় হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত সেচ প্রকল্পও বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে পানির অভাবে। শুধু সেচ প্রকল্পই নয়, নদীতে পানি প্রবাহ কমে গেলে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর যেমন নিচে নেমে যায়, তেমনই বাড়ে লবণাক্ততা। এসব কিছুই দেশের কৃষিখাতের জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ।

- **মৎস্য আহরণে ক্ষতি:** ভারত থেকে আসা গঙ্গা নদীর প্রবাহ প্রায় দুইশ প্রজাতির স্বাদু পানির মাছ ও চিংড়ির আবাস ভূমি। নদীতে বাঁধ দিয়ে পানি প্রবাহ কমিয়ে ফেলায় এসব মৎস্যের বিচরণ ও আবাসের জন্য প্রয়োজনীয় স্রোত, পুষ্টি উপাদান প্রাপ্তি, সহনশীল লবণাক্ততা ইত্যাদি ব্যাহত হচ্ছে। এক গবেষণায় দেখা গেছে, ফারাক্কা বাঁধের জন্য গঙ্গার পানি প্রবাহে পুষ্টি উপাদান কমে গেছে প্রায় ৩০% যা মাছের প্রধান খাদ্য ফাইটোপ্লাঙ্কটন উৎপাদনের জন্য জরুরি। এর বিরূপ প্রভাব পড়ছে এইসব নদী থেকে ধৃত মাছের পরিমাণের উপর। মাছ ধরার উপর নির্ভরশীল হাজার হাজার জেলে পরিবার চরম দুর্ভোগে পড়েছে পর্যাপ্ত মাছ না ধরতে পেরে।

বাংলাদেশ ভারত সম্পর্ক

- **নৌপথ হ্রাস পাওয়া:** বাংলাদেশের ভূখণ্ডে অসংখ্য ছোট বড় নদী জালের মত ছড়িয়ে আছে বলে যেকোনো স্থানে যাতায়াতের ক্ষেত্রে নৌপথ অত্যন্ত সাশ্রয়ী ও সুলভ মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হয়। কিন্তু ভারতের একতরফা গঙ্গা ও তিস্তার মত প্রধান নদীর পানি প্রত্যাহার করে নেওয়ায় শুষ্ক মৌসুমে বাংলাদেশ প্রায় ৩২০ কিলোমিটারের মতো নৌপথ ব্যবহার থেকে বঞ্চিত হয়। ফলে বিকল্প যাতায়াত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হওয়ায় খরচ বেড়ে যায়। তাছাড়া এসব অঞ্চলে যে মানুষগুলো নৌপথে নৌযান চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতো তারাও কর্মহীন হয়ে যায়।

- **জলবায়ু ও ভূপ্রকৃতির উপর বিরূপ প্রভাব:** একটি অঞ্চলের জলবায়ু, জীববৈচিত্র্য ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য অনেক কিছুই সে অঞ্চলের প্রাকৃতিক পানির উৎসের উপর নির্ভর করে। পর্যাপ্ত পানি প্রবাহ না থাকলে কোন কোন অঞ্চলের নদীগুলো শুকিয়ে যেতে থাকে এবং শুরু হয় মরুকরণ। ঐ অঞ্চল তখন জীবন ধারণের জন্য অনুপযোগী হতে থাকে। গঙ্গা ও তিস্তার পানি প্রবাহ আশঙ্কাজনক ভাবে কমে যাওয়ায় বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলেও মরুকরণ শুরু হয়েছে। শুষ্ক মৌসুমে আজকাল অনেক স্থানে শুধু বালু দেখা যায়। বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গ বর্তমানে অত্যন্ত রুক্ষ ও চরমভাবাপন্ন জলবায়ুর অঞ্চলে পরিণত হয়েছে অথচ এক সময় এ অঞ্চলের জলবায়ু শীতল ও সহনশীল ছিল। নদীর পানি প্রবাহ কমে যাওয়ায় জলজ জীববৈচিত্র্যের মারাত্মক ক্ষতি ঘটছে, অনেক প্রজাতির প্রাণী ও উদ্ভিদ পড়েছে বিলুপ্তির ঝুঁকিতে। একই সাথে মাটির আর্দ্রতা কমে যাওয়া, ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়া, লবণাক্ততা বৃদ্ধি ইত্যাদি বেড়ে যাওয়ায় স্বাভাবিক পরিবেশ ও প্রকৃতি হুমকির মুখে পড়েছে।

সীমান্ত হত্যা

LBA স্বাক্ষর

১৯৭৪ সালের ১৬ মে সীমান্ত সমস্যা সমাধানের জন্য ভারত ও বাংলাদেশ দিল্লিতে Land Boundary Agreement বা LBA নামে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। ৫টি ধারা সম্বলিত এই চুক্তিটি প্রায় চার দশক পর ২০১৫ সালে ভারত সরকারের অনুমোদনের পর কার্যকর হয়। এর ফলে দুই দেশের মধ্যে বিদ্যমান ১৬২টি ছিটমহলের বিনিময় সম্পন্ন হয় এবং অমীমাংসিত ভূমি ৬.৫ কিলোমিটার থেকে কমে ২ কিলোমিটারে আসে। খুব দ্রুত সে সমস্যারও সমাধান হবে বলেও আশা করা হচ্ছে।

JBWG প্রতিষ্ঠা

দুই দেশের মধ্যে সীমান্ত সমস্যার সমাধানের জন্য উভয় দেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন ২০০০ সালে যৌথ সীমান্ত কমিটি বা Joint Boundary Working Group, JBWG প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কমিটি বিরোধপূর্ণ সীমান্ত যেমন দইখাতা, লাঠিটিলা মুহুরীর নদী/চর ইত্যাদি মীমাংসার জন্য বদ্ধপরিকর। দুই দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী এই কমিটির সিদ্ধান্তের প্রতি শ্রদ্ধাশীল।

Strip Map প্রকাশ

দুই দেশের সীমান্তরক্ষীবাহিনী ২০১১ সালের ২৯ আগস্ট স্ট্রিপ ম্যাপ বা সীমান্ত মানচিত্র অবমুক্ত করে। ১৯৫৫ সালে উদ্যোগ নিলেও তা বাস্তবে রূপ নেয় ২০১১ সালে। এই ম্যাপের অন্তর্ভুক্ত আছে ১১২৯টি ছোট ছোট মানচিত্র। এখনও ২২ টি ম্যাপ বাকি রয়েছে।

ট্রানজিট ও ট্রানশিপমেন্ট

Transit

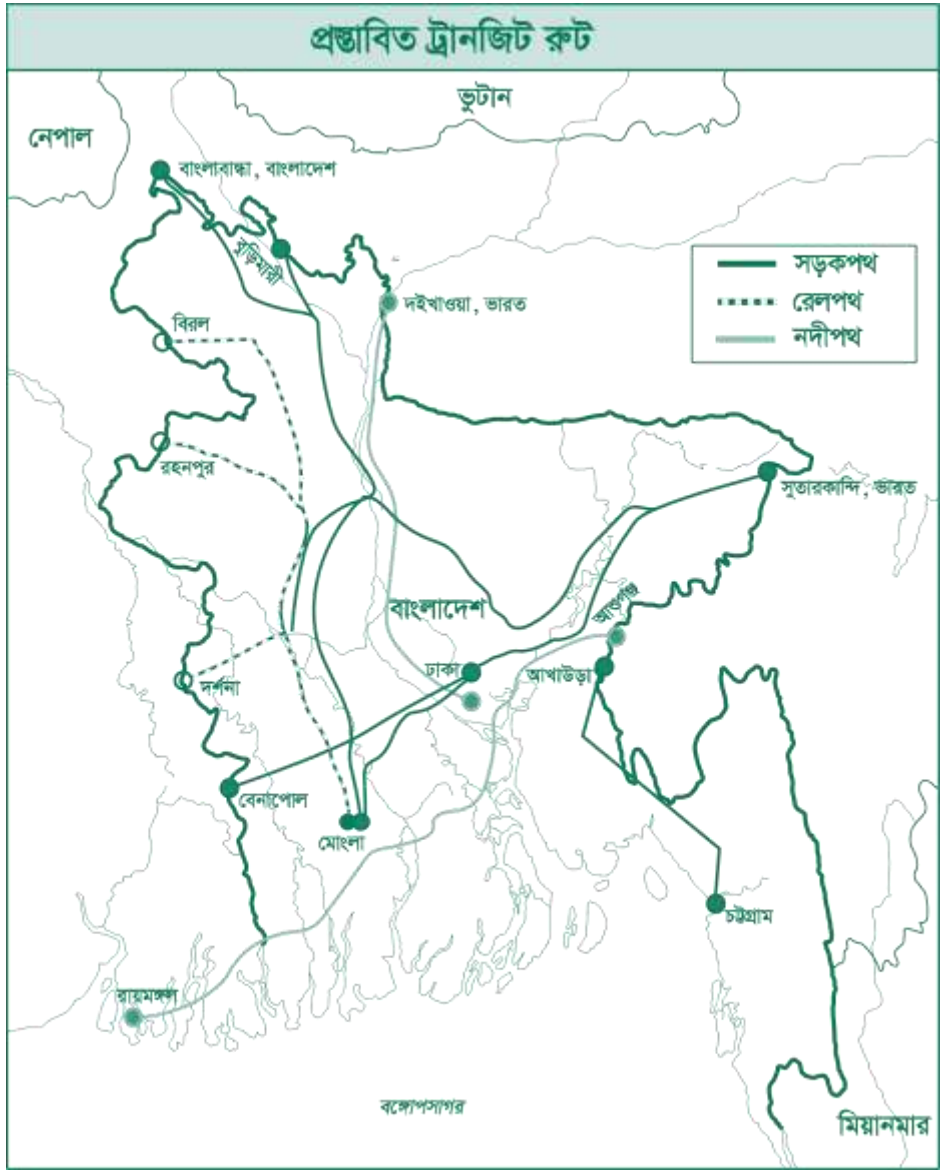

বাংলাদেশ ও ভারত সম্পর্কের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

কূটনৈতিক সম্পর্কের উন্নয়ন

২০০৯ সালে বর্তমান ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগ সরকার নির্বাচনে জয়লাভ করার পরই ভারতের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক উন্নয়নের উদ্যোগ নেয়। বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের সম্মাননাস্বরূপ ২০১৪ সালে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ২০১৯ সালে বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির শপথ পাঠের সময় অন্যতম আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ২০১৫ সালে নরেন্দ্র মোদির বাংলাদেশ সফরের মাধ্যমে ছিটমহল বিনিময়ের চুক্তি কার্যকর হয়েছিল। ২০২১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি ও মুজিব বর্ষের অনুষ্ঠানেও আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে বাংলাদেশে সফর করেন নরেন্দ্র মোদী। মূলত স্বল্পমেয়াদী ও ইস্যুভিত্তিক সমাধানের বদলে দুই দেশ বৃহৎ কাঠামোতে দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য সচেষ্ট হয়েছে। যে দুইটি দেশের মাঝে এত বড় সীমানা ও এতগুলো অমীমাংসিত ইস্যু রয়ে গেছে, তাদের মধ্যে টেকসই সম্পর্ক উন্নয়নের কোনো বিকল্প নেই।

বাংলাদেশ ও ভারত সম্পর্কের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

ছিটমহল বিনিময় ও স্থলসীমান্ত চুক্তি

বাংলাদেশ ও ভারতের মাঝে স্থলসীমান্ত নিয়ে সমস্যার ফলাফল ছিটমহল সুদীর্ঘ ৬৮ বছর যাবত দুই দেশের গলাতেই কাঁটার মতো বিঁধে ছিল। ১৯৭৪ সালে এ সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও তা বাস্তবায়নে প্রায় ৪ দশক লেগে যায়। অনেক প্রতীক্ষার পর ২০১৫ সালে ভারতের লোকসভায় ৩৩১-০ ভোটে সেই চুক্তি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিল পাশ হয় এবং সে বছরের ১লা আগস্ট ১৬২ টি ছিটমহল ২ দেশের মধ্যে বিনিময় হয়। ফলে ছিটমহলগুলোতে বসবাস করা মানুষদের দুর্ভোগের অবসান ঘটে, বাংলাদেশও প্রায় দশ হাজার একর জমি লাভ করে। এছাড়াও অমীমাংসিত ৬.৫ কিলোমিটার স্থল সীমান্তের মধ্যে ৪.৫ কিলোমিটার সীমান্তের সমাধান হয়ে গেছে, বাকি ২ কিলোমিটারের মীমাংসাও দ্রুত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। এসব সম্ভব হয়েছে কূটনৈতিক সম্পর্কের কার্যকর উন্নয়নের জন্যই।

বিদ্যুৎ ও তথ্য প্রযুক্তিগত বিনিময়

২০১৬ সাল থেকে ভারতে ব্যান্ডউইথ রপ্তানি করছে বাংলাদেশ। আবার ২০১৭ সাল থেকে বাংলাদেশ বিনা খরচে ভারতের দক্ষিণ এশিয়ার স্যাটেলাইট ব্যবহার করতে পারছে। এ ধরনের বিনিময়গুলো বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নে অবদান রাখছে। ২০১৩ সাল থেকে বাংলাদেশ ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানি করছে। বর্তমানে ভারতের বহরমপুর হতে বাংলাদেশের কুষ্টিয়ার ভেড়ামারয় এবং ত্রিপুরা হতে কুমিল্লা পর্যন্ত দুটি আন্তঃদেশীয় গ্রিড সংযোগ স্থাপিত হয়েছে। এই দুই গ্রিডে বর্তমানে ১১৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করা হচ্ছে।

ভারতের আদানি গ্রুপ ভারতের ঝাড়খন্ডে ১৬০০ মেগাওয়াট কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করছে, যা সরাসরি বাংলাদেশের জাতীয় গ্রিড সিস্টেমের সাথে যুক্ত হবে।

বাংলাদেশ ও ভারত সম্পর্কের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

বাংলাদেশে ভারতের বিনিয়োগ ও ঋণ

ভারতের সাথে প্রতিবছর বাংলাদেশের ১০০০ কোটি ডলারেরও বেশি বাণিজ্য হয়। ১৯৯৬ সালে আওয়ামীলীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর বাংলাদেশের বিভিন্ন খাতে ভারতের বিনিয়োগ আসতে শুরু করে। বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) এর তথ্য মতে, গত ২৬ বছরে বাংলাদেশে ভারতের বিনিয়োগ হয়েছে ৬৫২.৩৮ মিলিয়ন ডলার বা প্রায় সাড়ে ৬৫ কোটি ডলার।

সাম্প্রতিক বিভিন্ন চুক্তি ও সমঝোতা

২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৪ দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে ভারতে গিয়েছিলেন। এ সময় ভারতের সাথে ৭টি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে বাংলাদেশ।

- ✓ সুরমা-কুশিয়ারা প্রকল্পের অধীনে কুশিয়ার নদী থেকে বাংলাদেশের ১৫৩ কিউসেক পানি প্রত্যাহারের বিষয়ে সমঝোতা স্মারক (এমওইউ)।
- ✓ বৈজ্ঞানিক সহযোগিতা বিষয়ে ভারতের বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের (সিএসআইআর) সঙ্গে বাংলাদেশের সিএসআইআরের সমঝোতা স্মারক।

বাংলাদেশ ও ভারত সম্পর্কের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

- ✓ বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে ভারতের ভোপালে ন্যাশনাল জুডিশিয়াল অ্যাকাডেমির একটি সমঝোতা স্মারক।
- ✓ ভারতের রেলওয়ের প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটগুলোতে বাংলাদেশ রেল কর্মীদের প্রশিক্ষণের জন্য দুই দেশের রেল মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমঝোতা স্মারক।
- ✓ বাংলাদেশ রেলওয়ের তথ্যপ্রযুক্তিগত সহযোগিতার জন্য ভারত ও বাংলাদেশের রেল মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমঝোতা স্মারক।
- ✓ ভারতের রাষ্ট্রীয় সম্প্রচারমাধ্যম 'প্রসার ভারতীর' সঙ্গে বাংলাদেশ টেলিভিশনের সমঝোতা স্মারক।
- ✓ মহাশূন্য প্রযুক্তি ক্ষেত্রে সহযোগিতা বিষয়ে বিটিসিএল এবং এনএসআইএল এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এবারের সফরের এজেন্ডায় অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্কের বিষয়গুলো বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। বিশেষ করে প্রস্তাবিত কম্প্রিহেন্সিভ ইকোনমিক পার্টনারশিপ এগ্রিমেন্টের (সেপা) বিষয়ে উভয় দেশের প্রধানমন্ত্রী এবার আনুষ্ঠানিক সংলাপ শুরু করার জন্য সম্মত হয়েছেন। এটি মূলত একটি মুক্তবাণিজ্য চুক্তি। আরও বলা যায়, এর পরিসর মুক্তবাণিজ্য চুক্তির চেয়ে অনেক বেশি। ২০১৮ সাল থেকে সেপার বিষয়ে ভারত আগ্রহ দেখিয়ে আসছে। বাংলাদেশের সঙ্গে চীনের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক এবং বিনিয়োগ সম্পর্কের কারণেই ভারতের এমন আগ্রহ রয়েছে বলে অনেকে মনে করে থাকেন।

বাংলাদেশ-মিয়ানমার সম্পর্ক

চিত্র: মিয়ানমার

বাংলাদেশ-মিয়ানমার সম্পর্ক

রোহিঙ্গা সমস্যা ও বাংলাদেশ

সংকটের শুরু

১৯৬২ সালে জেনারেল নে উইন সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করলে রোহিঙ্গাদের জন্য শুরু হয় দুর্ভোগের নতুন অধ্যায়। ১৯৭৮ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে জুলাই পর্যন্ত 'অপারেশন ড্রাগন কিং' নামক সেনা অভিযানে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড চালায় বার্মা। বার্মিজ সেনাদের এই নৃশংস আক্রমণে ২.৫ লাখ রোহিঙ্গা পালিয়ে বাংলাদেশে চলে আসে। পরে একটি চুক্তির মাধ্যমে ১.৮ লাখ রোহিঙ্গা মিয়ানমারে ফিরে যায়। রোহিঙ্গারা ১৯৮২ সালের মিয়ানমারের নাগরিকত্ব আইনের কারণে নাগরিকত্ব হারান। ফলে তাদের উপর রাষ্ট্রীয়ভাবে অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে যায়।

উত্তর রাখাইনে ১৯৯১-৯২ সালে রোহিঙ্গাদের উপর 'অপারেশন ক্লিন এন্ড বিউটিফুল নেশন' নামক আরেকটি অভিযান চলে। এই অভিযানে ২.৫ লাখ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে শরণার্থী হয়। এরপর ২০১২ সালে ও ২০১৬ সালে যথাক্রমে ১ লাখ ও ৮৭ হাজার রোহিঙ্গা বাস্তুচ্যুত হয়ে বাংলাদেশে চলে আসে। ২০১২ সালে রাখাইনের বৌদ্ধদের দ্বারা সৃষ্ট বৌদ্ধ-হিন্দু দাঙ্গায় ১৬৮ জন মুসলিম মারা যান, অপরদিকে ২০১৬ সালে মিয়ানমারের সেনাবাহিনীই সরাসরি অভিযান চালায় রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে।

বাংলাদেশ-মিয়ানমার সম্পর্ক

২৪ আগস্ট, ২০১৭ তারিখে মিয়ানমারের সীমান্ত চৌকিতে কথিত সন্ত্রাসী হামলায় ৮৯ জন পুলিশ নিহত হয়। হামলার জন্য রোহিঙ্গাদের সংগঠন 'আরসা'কে দায়ী করে মিয়ানমারের সেনাবাহিনী। এরপরই ২৫ আগস্ট, ২০১৭ হতে মিয়ানমারের সেনাবাহিনী Ethnic Cleansing অভিযান চালায় রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। ২৫ আগস্টের সকাল থেকেই রাখাইন রাজ্যের গ্রামগুলো জ্বলতে শুরু করেছিল। এটি ছিল পূর্ব পরিকল্পিত রোহিঙ্গা উৎখাতকল্পে গণহত্যার সূত্রপাত। অতিদ্রুত ৪১৭টি গ্রামের ৯০ ভাগের বেশি পুড়িয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে হত্যা, ধর্ষণ এবং লুটপাটের মতো গর্হিত কাজ সম্পন্ন করেছে। বিবিসির এক হিসেবে দেখা যায়, সেনাবাহিনী শুধু সেপ্টেম্বর মাসেই ৭০০০ জনের বেশি শিশুকে হত্যা করে। Human Rights Watch (HRW) স্যাটেলাইট ইমেইজ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছে যে, রাখাইনে ২৮৮টি গ্রাম আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। ২৫ আগস্ট, ২০১৭ থেকে ২০১৮ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত জাতিসংঘের হিসেবে ১১,৫০,০০০ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আসে। চীনের উদ্যোগে ২ বার রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের চেষ্টা করা হলে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী ২৫ আগস্ট, ২০১৯ সালে ৫ দফা দাবির ভিত্তিতে ফিরে যাবার শর্ত দেয়।

বাংলাদেশ-মিয়ানমার সম্পর্ক

বর্তমান পরিস্থিতি

রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মাঝে 'Arrangement on returns of the displaced people of Rakhaine State' শিরোনামে প্রত্যাবাসন চুক্তি স্বাক্ষর হয় ২৩ নভেম্বর, ২০১৭ সালে। চুক্তির ৬ বছর অতিক্রান্ত হলেও রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন করা সম্ভব হয়নি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭৪ থেকে ৭৭তম অধিবেশনে মোট ৪ বার রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন কথাটি উত্থাপন করলেও তেমন বৈশ্বিক সাড়া পাওয়া যায়নি। এদিকে ২০২১ সাল থেকে মিয়ানমারে শুরু হয়েছে সেনা শাসনের নতুন অধ্যায়। এই পরিস্থিতিতে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন অনেকটা অনিশ্চিত পর্যায়ে চলে যাচ্ছে। বাংলাদেশের মতো ছোট দেশের পক্ষে ১১.৫০ লক্ষ রোহিঙ্গাদের বহন করা এখন গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রোহিঙ্গা সমস্যার প্রভাব

বাংলাদেশ একটি ছোট ও ঘনবসতির দেশ। ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কি.মি. আয়তনের বাংলাদেশে বর্তমান জনসংখ্যা ১৬ কোটি ৯৮ লাখ ২৮ হাজার ৯১১ জন। নিজ দেশের অধিক জনসংখ্যা নিয়ে বাংলাদেশ এমনিতে ব্যাপক চিন্তিত। রোহিঙ্গা সমস্যা মানবিক হলেও দুটি কারণে বাংলাদেশের পক্ষে রোহিঙ্গাদের অনুপ্রবেশ নেওয়া সম্ভব নয়। কারণ বাংলাদেশে আগে থেকেই অন্তত ৪ লাখ রোহিঙ্গা অবস্থান করছে। ঘনবসতির এই দেশে তারা ইতোমধ্যে ব্যাপক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেমন- অবৈধভাবে অবস্থান করে আইন শৃঙ্খলার জন্যও তারা বিড়ম্বনা সৃষ্টি করছে। একটি ক্ষুদ্র অংশ চরম পন্থা ও জঙ্গিবাদের সঙ্গে জড়িত যা নিরাপত্তার জন্য সমস্যা সৃষ্টি করছে। বিভিন্ন রোহিঙ্গা মাদক ব্যবসায়ী, তারা অবৈধভাবে বাংলাদেশের পাসপোর্ট ব্যবহার করে বিভিন্ন দেশে যাচ্ছে এতে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে।

বাংলাদেশ-মিয়ানমার সম্পর্ক

তাছাড়া মিয়ানমার তাদের লাখ লাখ রোহিঙ্গাদের পূর্বে যারা বাংলাদেশে অবস্থান করেছে তাদের নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের ফলে বাংলাদেশে যেসব সমস্যা বা সংকট সৃষ্টি হয়েছে তা নিচে পয়েন্ট আকারে তুলে ধরা হলো:

✓ অর্থনৈতিক চাপ	✓ বনভূমি ধ্বংস
✓ নিরাপত্তা ঝুঁকি	✓ পর্যটন শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত
✓ পরিবেশ সংক্রান্ত ঝুঁকি	✓ স্বাস্থ্য ঝুঁকি
✓ প্রাকৃতিক দুর্যোগের আশঙ্কা	✓ অপরাধ প্রবণতা
✓ জনসংখ্যা সমস্যা	✓ বিভিন্ন মহামারি ছড়ানোর হটস্পট

বাংলাদেশ-মিয়ানমার সম্পর্ক

সম্ভাব্য সমাধান ও সুপারিশসমূহ

প্রধানমন্ত্রীর ৩টি প্রস্তাব বাস্তবায়ন করা : ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ সালে রোহিঙ্গা সংকট চিরতরে সমাধানের জন্য নিউইয়র্কে "শরণার্থী বিষয়ক বৈশ্বিক প্রভাবের উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক" এ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিন দফা সুপারিশ করেন।

- ✓ মিয়ানমারকে রোহিঙ্গাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আইন ও নীতি বাতিল করতে হবে।
- ✓ মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের নাগরিক সুবিধা ও অধিকার নিশ্চিত করে একটি সহায়ক পরিবেশ বা প্রয়োজনে সেফ জোন প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
- ✓ জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশনের সুপারিশের আলোকে ন্যায়বিচার ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদেরকে নৃশংসতার হাত থেকে বাঁচাতে হবে।

বাংলাদেশ-মিয়ানমার সম্পর্ক

রোহিঙ্গাদের পাঁচটি দাবির বাস্তবায়ন

যেহেতু রোহিঙ্গারা বারবার মিয়ানমারের জান্তা সরকারের দ্বারা নির্যাতনের শিকার হয়েছে, তাই এ সমস্যা সমাধানে তাদের দাবিসমূহ বিবেচনায় রাখতে হবে। রোহিঙ্গাদের দাবিসমূহ –

- ✓ **নাগরিকত্ব:** আরাকানরাজ্যে বসবাসরত রোহিঙ্গাদের 'সিটিজেন কার্ড' দিতে হবে।
- ✓ **প্রত্যাবাসন:** নিজের গ্রামে ফিরিয়ে নেওয়া ও জমিজমা ক্ষতিপূরণসহ ফেরত দিতে হবে।
- ✓ **নিরাপত্তা:** জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী মোতায়ন করতে হবে।
- ✓ **জবাবদিহিতা:** আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালে অপরাধীদের বিচার করতে হবে।
- ✓ **ন্যাটিভ স্ট্যাটাস:** ন্যাটিভ স্ট্যাটাস বা স্থানীয় মর্যাদা সংসদে আইন করে পুনর্বহাল করতে হবে।

বাংলাদেশ-মিয়ানমার সম্পর্ক

রোহিঙ্গা সংকট মোকাবিলায় আরও যেসব পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে -

- রোহিঙ্গা শরণার্থীদের প্রত্যাবাসনের অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করে দ্রুত ফিরিয়ে নিতে জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সকল সংস্থা ও পশ্চিমা বিশ্বকে এই উদ্যোগের সাথে সম্পৃক্ত করা বিশেষ করে মিয়ানমারের ঘনিষ্ঠ রাষ্ট্র ভারত, চীন এবং রাশিয়াকে রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে জড়িত করা।
- রাখাইনে রোহিঙ্গা নিধনযজ্ঞে জড়িত মিয়ানমারের নিপীড়নকারী ও দায়ী সেনা কর্মকর্তা ও মগদেরকে চিহ্নিত করে আন্তর্জাতিক আদালতের মাধ্যমে বিচারের মুখোমুখি দাঁড় করানো।
- গাম্বিয়ার দায়ের করা মামলায় আন্তর্জাতিক আদালতের অন্তর্বর্তী রায়ের নির্দেশনা প্রতিপালনে মিয়ানমারকে বাধ্য করতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নিবিড় সম্পর্ক বজায় রাখা ও সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করা।
- জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলের নেতৃত্বে অনুসন্ধান কমিশনের সুপারিশমালার আলোকে রাখাইনের হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত সকলকে বিচারের আওতায় আনার জন্য জাতিসংঘকে সক্রিয় করতে বাংলাদেশের পক্ষ হতে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা।

বাংলাদেশ-মিয়ানমার সম্পর্ক

- মিয়ানমারের নাগরিক সংশোধন আইন ১৯৮২ পরিবর্তন করে রোহিঙ্গাদের সাংবিধানিক নাগরিক অধিকার সংবিধানে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে মিয়ানমারকে বাধ্য করতে আন্তর্জাতিক চাপ প্রয়োগের জন্য বাংলাদেশের কূটনৈতিক তৎপরতা অব্যাহত রাখা।
- মিয়ানমার সরকারকে অবশ্যই রাখাইনে নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করতে এবং রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সবধরনের নিরাপত্তা ও নিরাপদ চলাচলের সুযোগ সৃষ্টি করতে কূটনৈতিক চাপ অব্যাহত রাখা।
- বৈষম্যমূলক সকল নীতি ও আইনকানুন তুলে নিয়ে রোহিঙ্গাদের শান্তিপূর্ণ বসবাসের নিরাপদ চলাচলের স্বাধীন ধর্ম ও কর্ম পালনের অধিকার নিশ্চিত করতে মিয়ানমারকে বাধ্য করা।
- মিয়ানমার সরকারকে অবশ্যই রাখাইন রাজ্যে অসহিষ্ণু ও নিপীড়ক বৌদ্ধ ধর্মীয় গুরু ও ধর্মীয় সম্প্রদায়কে নিবৃত্ত করতে এবং আইনের আওতায় আনতে মিয়ানমারকে চাপ প্রয়োগ করা। একইসাথে সহিংসতা বন্ধে বৌদ্ধধর্মের স্কলারদেরকে কাজে লাগাতে হবে যাতে করে ধর্মের নামে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী অন্য ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ওপর সহিংসতা না চালায়।

বাংলাদেশ-মিয়ানমার সম্পর্ক

- মিয়ানমারের কৌশলগত মিত্র ও প্রতিবেশী এবং বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠ বন্ধু রাষ্ট্র ভারত, রাশিয়া ও চীনকে রোহিঙ্গা শরণার্থী প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত ও সম্পৃক্ত করা।
- বাংলাদেশ সরকারকে অত্যন্ত দক্ষ ও সর্বোচ্চমাত্রার অন্তর্ভুক্তিমূলক কূটনৈতিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। প্রতিবেশী দেশসহ বিশ্ব শক্তিকে রোহিঙ্গা সংকটের বহুমুখী প্রভাব ও ফলাফল অনুধাবনের জন্য কার্যকর কূটনৈতিক পন্থা অবলম্বন করতে হবে যাতে করে প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে মিয়ানমার বাধ্য হয়।
- মিয়ানমারের বাস্তুচ্যুত শরণার্থীকে তাদের আবাসভূমিতে ফিরিয়ে নিতে সকল অঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থা ও শক্তিকে সম্মিলিতভাবে মিয়ানমারের ওপর চাপ প্রয়োগ করতে সক্রিয় করা।
- রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে বাংলাদেশে সকল রাজনৈতিক দল, মত, গোষ্ঠী নির্বিশেষে সকলকে নিয়ে সম্মিলিত ঐক্য ও জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলা এবং সংঘবদ্ধ হয়ে মিয়ানমারের ওপর দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক চাপ সৃষ্টি করা।

বাংলাদেশ-মিয়ানমার সম্পর্ক

- রোহিঙ্গা সংকট একটি জটিল ও বহুমাত্রিক সমস্যা। এই সমস্যার কার্যকর সমাধানের জন্য কূটনীতিক, নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ, রাজনৈতিক প্রতিনিধি, একাডেমিক ও গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব, বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফল পেশাজীবী ও কৌশলবিদসহ সংশ্লিষ্টজনদেরকে নিয়ে একটি রোহিঙ্গা টাস্কফোর্স গঠন করা যাতে করে ওই টাস্কফোর্স ভূরাজনৈতিক, আঞ্চলিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিষয় বিবেচনায় নিয়ে রোহিঙ্গা সংকটের একটি গ্রহণযোগ্য সমাধান খুঁজে বের করতে পারে।
- জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রোহিঙ্গা সংকট সমাধানের যে প্রস্তাব দিয়েছে তার যে-কোনো একটিকে ভিত্তি ধরে সংকট সমাধানের জন্য কার্যকর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া এবং আগ্রাসী কূটনৈতিক তৎপরতা শুরু করা।

বাংলাদেশ-মিয়ানমার সম্পর্ক

- নিরাপদ ও টেকসই প্রত্যাবাসনের পূর্বে মিয়ানমার সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের প্রতি রোহিঙ্গা শরণার্থীর আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন অপরিহার্য, সেজন্য রোহিঙ্গা শরণার্থীদের প্রতিনিধিসহ জাতিসংঘের নেতৃত্বে একটি আন্তর্জাতিক প্রতিনিধিদল মিয়ানমারের রাখাইন অঞ্চল পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা এবং প্রতিনিধিদলের সন্তোষজনক রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রত্যাবাসন শুরু করা।

পরিশেষে বলা যায় রোহিঙ্গা শরণার্থী সমস্যা একটি আন্তর্জাতিক ইস্যু। বেঁচে থাকা ও নিজ ভূমিতে অবস্থান সব মানুষের জন্মগত অধিকার। এই অধিকার থেকে বঞ্চিত রোহিঙ্গাদের স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার করুণ আর্তি ও অতীত ইতিহাস বিশ্ব বিবেকের সামনে তুলে ধরা একান্ত প্রয়োজন।এছাড়াও আন্তর্জাতিক মহলে রোহিঙ্গা সমস্যার প্রকৃত তথ্য উন্মোচন ও সুদক্ষ কূটনৈতিক কৌশলের মাধ্যমে এ সমস্যার আশু কার্যকর সমাধান করা জরুরি।

বাংলাদেশ-মিয়ানমার সম্পর্ক

সমুদ্রসীমা নিয়ে বিরোধ

বাংলাদেশের ১৯৭৪ সালের সমুদ্র আইন অনুযায়ী নিজের সমুদ্রসীমা মেনে নিলেও মিয়ানমার তা মেনে নেয়নি। ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি মিয়ানমার বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব সমুদ্রসীমার ভেতরে সেন্টমার্টিন দ্বীপের কিছু মাইল দূরে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করে। এ সময় অবৈধভাবে কোরিয়ান কোম্পানির সহায়তায় মিয়ানমার এই তেল-গ্যাস অনুসন্ধান চালায়। বাংলাদেশ এ কার্যক্রমের প্রতিবাদ জানানোর পাশাপাশি নৌবাহিনীর জাহাজ ঘটনাস্থলে অবস্থান নিলে জরিপকারী মিয়ানমারের পক্ষ থেকে সরকারিভাবে এই অনুসন্ধান কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করে কিন্তু ২০০৮ সালে মিয়ানমার আবারও গভীর সমুদ্রে বাংলাদেশি এলাকায় গ্যাসের অনুসন্ধান চালালে, সংঘাতময় অবস্থার সৃষ্টি হয়। তিন দশকের বেশি সময় ধরে মিয়ানমারের সঙ্গে সমুদ্রসীমার বিরোধ নিষ্পত্তি না হওয়ায় ২০০৯ সালের অক্টোবরে সমুদ্র আইন বিষয়ক জাতিসংঘের কনভেনশন মেনে জার্মানির হামবুর্গে অবস্থিত সমুদ্র আইন সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালে (ITLOS) যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় বাংলাদেশ। ১৪ ডিসেম্বর, ২০০৯ সালে ITLOS এ মামলা দাখিল করে বাংলাদেশ। এটি ITLOS এর ১৬তম মামলা হিসেবে নথিভুক্ত হয়। ২০১০ সালের ১ জুলাই বাংলাদেশ নিজের পক্ষে সব দালিলিক প্রমাণ আদালতে উপস্থাপন করে। সব যুক্তিতর্ক উপস্থাপন শেষে ২০১২ সালের ১৪ মার্চ বাংলাদেশ ২০-১ ভোটে জয়লাভ করে। বাংলাদেশ বঙ্গোপসাগরে এ রায়ের ফলে ১ লাখ ১১ হাজার বর্গ কি.মি এলাকার মালিক হয়। এ রায়ের ফলে সমুদ্র উপকূল থেকে ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত সমুদ্রসীমায় বাংলাদেশের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০১৫ সালে মিয়ানমার এই রায়ের বিপক্ষে আপিল করেছে।

বাংলাদেশ-মিয়ানমার সম্পর্ক

সীমান্ত ও নিরাপত্তা জনিত সমস্যা

বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে নিবিড় অরণ্য এবং পাহাড় পর্বতসহ ২৭১ কিলোমিটারের বেশি স্থলসীমান্ত এবং ৬৩ কিলোমিটার সমুদ্রসীমা রয়েছে। দুই দেশের মধ্যে ১৯৭২ সালে কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার সাত বছর পর ১৯৭৯ সালে মিয়ানমারের প্রেসিডেন্ট জেনারেল নে উইনের বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় সফরের সময় সীমানা নির্ধারণী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৮৫ সালের ১২ আগস্ট বাংলাদেশ-মিয়ানমারের যৌথ জরিপ দল সীমানা চিহ্নিতকরণ সম্পন্ন করার পর সে বছরই মিয়ানমার নিজ সীমান্ত এলাকায় ২০ হাজার নিয়মিত সৈন্য মোতায়েন করে। অথচ আন্তর্জাতিক নীতিমালার বিধান হচ্ছে প্রতিবেশী সীমান্ত বরাবর আট কিলোমিটারের মধ্যে সেনা সমাবেশ করা যাবে না। এরপর ১৯৯২ সালে সীমান্তবিরোধ নিয়ে দুই দেশের মধ্যে ব্যাপক উত্তেজনা হয়। মংডু ও ঘুমধুম সীমান্ত নিয়ে দুই দেশের মধ্যে এখনো বিরোধ চলমান। সম্প্রতি দুই দেশের মাঝে এই বিরোধ আরও ঘনীভূত হয়েছে সীমান্তে মিয়ানমারের মাইন স্থাপনকে কেন্দ্র করে।

বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্ত মাদক চোরাচালানের অন্যতম রুট হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ইয়াবা ও মাদকের অভয়ারণ্য হিসেবে দেখা দিয়েছে এই দুই দেশের সীমান্ত। ইতোমধ্যে কক্সবাজারের উখিয়া পয়েন্ট পরিচিতি পেয়েছে 'ইয়াবা পয়েন্ট' হিসেবে। আর এসব কর্মকাণ্ড নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করছে। এছাড়াও এই সীমান্ত অঞ্চলে অবৈধ অস্ত্র বেচা কেনা হয়, যার অধিকাংশই ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের স্বাধীনতাকামী বিদ্রোহী গোষ্ঠীর হাতে পড়ে। কঠোর নিরাপত্তা না থাকায় বিভিন্ন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে এই দুই দেশের সীমানা ব্যবহৃত হয়। মিয়ানমার থেকে অবৈধভাবে নিত্য ব্যবহার্য পণ্য সহজেই সীমানা পার হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে।

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

- শ্রীলঙ্কার বর্তমান অর্থনৈতিক সংকটের প্রধান কারণ কী? শ্রীলঙ্কা কীভাবে এ অর্থনৈতিক সংকট কাটিয়ে উঠতে পারে? মতামত দিন। [৪৪তম বিসিএস লিখিত]
- ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে সম্পাদিত কোন চুক্তি অনুযায়ী 'যৌথ নদী কমিশন' প্রতিষ্ঠিত হয়? বাংলাদেশের জন্য যৌথ নদীগুলোর ন্যায্য পানি প্রাপ্যতার ক্ষেত্রে এই কমিশনের ভূমিকা বিশ্লেষণ করুন। [৪৪তম বিসিএস লিখিত]
- শ্রীলঙ্কার সাম্প্রতিক সংকট দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর জন্য কী কী বার্তা বহন করছে? আলোচনা করুন। [৪৩তম বিসিএস লিখিত]
- সার্কভুক্ত দেশগুলোর উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব আলোচনা করুন। [৪৩তম বিসিএস লিখিত]
- 'বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ'-এ যুক্ত হয়ে বাংলাদেশের ঋণের ফাঁদে পড়বার সম্ভাবনা নেই বলে বিশেষজ্ঞরা মত দিয়েছেন। মন্তব্যসহ আলোচনা করুন। [৪১তম বিসিএস লিখিত]

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

- রোহিঙ্গা সমস্যার দীর্ঘমেয়াদী সমাধানের লক্ষ্যে একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরি করুন। [৪১তম বিসিএস লিখিত]
- দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে শান্তি ও নিরাপত্তার হুমকিসমূহ ব্যাখ্যা করুন। এ অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠায় আপনার সুপারিশসমূহ কী কী? [৪০তম বিসিএস লিখিত]
- বাংলাদেশ-মিয়ানমার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি চিহ্নিত করুন। [৩৮তম বিসিএস লিখিত]
- রোহিঙ্গা ইস্যুকে আপনি কী 'জাতীয় নিরাপত্তার সংকট' না 'মানবতার সংকট' হিসেবে বিবেচনা করেন? আপনার বিবেচনায় এ সংকট মোকাবেলা করার কৌশল ও পদক্ষেপসমূহ আলোচনা করুন। [৩৮তম বিসিএস লিখিত]
- চীন ও ভারতের সম্পর্ক নিয়ে একটি রচনা লিখুন। এই দুটি রাষ্ট্রের সম্পর্কের গতি প্রকৃতি এশিয়ায় বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়ায় কি প্রভাব রাখছে তা পর্যালোচনা করুন। [৩৭তম বিসিএস লিখিত]

Facebook Page
https://www.facebook.com/uttoronacademy

Facebook Group (BCS উত্তরণ)
https://www.facebook.com/groups/www.uttoron.academy

YouTube Channel
https://www.youtube.com/c/Uttoron

Best of Luck!!!

BCS কঠিন নয়;
প্রস্তুতি যদি গোছানো হয়

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি

BCS অনলাইন ও অফলাইনের সমন্বয়ে গোছানো প্রস্তুতি (https://www.youtube.com/watch?v=MFKW8FSNnP0)

09666775566
www.uttoron.academy